এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের রেখা চিত্রটি কবিগুরুর নিজ হাতে অঙ্কিত একটি চিত্রের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কৃত অনুকৃতি, 'বিশ্ব ভারতী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রকাশক
শ্রীপরিতোষ দে
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি, এল, রায় স্ট্রীট
কলিকাতা ৬



মূল্য—২৲

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৭

'বাবা ও মা'কে

# ভূমিকা

মানুষের আচরণে অসংগতি-অশোভনতার অন্ত নেই, এই বিচিত্র অসংগতির প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে যে বিরক্তি ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের উদয় হয় তারও অন্ত নেই। এই আবেগগুলি নির্ভর করে দ্রষ্টার মানসিক অবস্থা কিংবা মননভঙ্গীর উপরে। এসব আবেগের মধ্যে একমাত্র কৌতুকানুভূতিই আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রীতিকর। তাই স্বভাবতই এই কৌতুকবোধকে সাহিত্যের উপজীব্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই কৌতুককে আশ্রয় করে যে সাহিত্য রসের উদ্‌ভব হয় তারই নাম হাস্যরস। ভারতীয় আলংকারিকদের মতে হাস্যরসসৃষ্টি সাহিত্যরচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে যে হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাই এবং অলংকার-শাস্ত্রে যার বর্ণনা দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তারই অনুবর্তন চলে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হাস্যরসের বিবর্তনের বা বৈচিত্র্যসৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। হাস্যরস রচনার বিপদ্ এই যে, যদি তা যথার্থ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত না হয় তবে তা অনিবার্যরূপেই কদর্য রুচিবিকৃতি বা ভাঁড়ামির স্তরে নেমে যায়; আর সামান্য রুচিবিকারের সংস্পর্শে নির্মল হাস্যরসও গেঁজে উঠে ভদ্রসমাজের

অযোগ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত হাস্যরস রচনার প্রয়াসটাই অনেক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য এই নিম্নস্তরের রুচিবিকারের অজস্রতায় পরিপূর্ণ। অতঃপর মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালির হাস্যরসে নূতন স্বাদগন্ধ দেখা দিল; তখন থেকেই বাংলা হাস্য-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের আবিলতা ঘুচিয়ে পরিস্রুত নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বাংলার হাসিকে অনাবিল আনন্দের আলোতে যাঁরা উজ্জ্বল করে তুলেছেন, তাঁর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীতে হাসাবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাকে কিছুতেই উচ্চাঙ্গের বলে বর্ণনা করা চলে না। তার সঙ্গে লোকরহস্য বা কমলাকান্তের যে ব্যবধান তা কালের মাপে খুবই স্বল্প, কিন্তু রসোৎকর্ষের মাপে তা উপেক্ষণীয় নয়।

হাস্যরস সৃষ্টিতে বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন এবং প্রতিভার প্রকৃতিভেদে হাসির রচনাতেও বৈচিত্র্য ঘটে। তা ছাড়া উপলক্ষ্য বা উপাদানভেদেও হাসির রূপভেদ হয়। রহস্য, পরিহাস, কৌতুক, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, রগড়, মজা, তামাশা প্রভৃতি আসলে পরস্পরের ঠিক প্রতিশব্দ নয়; এগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তদনুসারে আমাদের হাসিতেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। বিভিন্ন ফলের স্বাদে বা ফুলের গন্ধে যে বিচিত্রতা, বিভিন্ন ধরণের হাস্যরসেও সেই বিচিত্রতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই বাঙালির দন্তবিকাশভঙ্গীতে নিত্য নবীনতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল. রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, পরশুরাম, সুকুমার রায় প্রভৃতি আমাদের যে হাসির রস পরিবেশন করেছেন তার স্বাদপার্থক্য যিনি অনুভব করতে পারেন না,

তাঁকে রহস্যনিবেদন দুর্ভাগ্যেরই নামান্তর। এই স্বাদপার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য নয়। তবু একটিমাত্র কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের কাছে ফলের গন্ধের যে ব্যঞ্জনা, মৌমাছির কাছে ফুলের গন্ধেরও তাই; উভয়ত্র ভোজ্যত্বের ইঙ্গিত অনতিপ্রচ্ছন্ন। ওই গন্ধে যে আনন্দের উদ্‌ভব হয় তা অহেতুক নয়। পক্ষান্তরে মানুষের কাছে ফুলের গন্ধের যে ব্যঞ্জনা, তাতে রসনাগ্রাহ্যতার আভাসমাত্রও থাকে না। এ ভাবে দেখলে বলা যায় হাস্যরসের রচনাও মোটামুটিভাবে দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর রচনা হাসির গন্ধে মানুষের মনকে আকর্ষণ করে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে, আর এক শ্রেণীর রচনা ফুলের সৌরভের মতো শুধু হাসির মাধুর্য বিকিরণ করেই সার্থকতা লাভ করে। এই যে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ হাস্যরস, তা ফলশস্যের মতো কোনো স্থূলবস্তুকে আশ্রয় করে থাকে না; তার আশ্রয় ফুলের পাপড়ির মতোই লঘু ও পেলব, তার স্পর্শে কেউ আহত হয় না। এই অহেতুক লঘু হাসির উপলক্ষ্য হতে পারে দুনিয়ার সব কিছুই, এমন কি রচয়িতা নিজেও। বিলেতি শিক্ষার মোহগ্রস্ত সাহেবন্মন্য বাঙালিকে লক্ষ্য করে মধুসূদন তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নব বাবুর মুখে বসিয়েছেন এই উক্তি—

"জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েচি।'

তখনকার দিনে সকলেই জানতেন এই উক্তি মধুসূদনের নিজের সম্বন্ধেই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজ্য। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলেতফেরতা' প্রভৃতি হাসির গানেও রচয়িতা নিজেই হাস্যাস্পদের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হাসবার ক্ষমতা সকলের স্বভাবগত নয়। হাসি কারও কারও

জন্মসহচর; আবার সুকুমার রায়ের 'রামগরুড়ের ছানা'-জাতীয় মানুষেরও অভাব নেই সংসারে। শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, জাতিতে জাতিতেও এই পার্থক্য দেখা যায়। সব জাতি সমান রসিক নয়, সব সাহিত্যের হাস্যসম্পদ্‌ও সমান নয়। সুখের বিষয় বাঙালি জাতিকে অরসিক পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করবার কারণ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা' কথাটাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চৈতন্যপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের যে ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার থেকে বাঙালি জাতির পূর্ণ পরিচয় পাবার আশা করা যায় না। 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ', 'বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে' ইত্যাদি উক্তিতে পরোক্ষেও কোনো রসিকতা প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝেই যে হাস্যের রোল শোনা যায় তাতে আর কিছু না হোক বাঙালিকে নেহাতই রামগরুড়ের জাতি বলে মনে করা যায় না। চৈতন্যদেব নিজেও অরসিক ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে তৎকালীন সাহিত্যে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত (১।১০) থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করি।—

সভার সহিত প্রভু হাস্যকথারঙ্গে
কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে।
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।···

বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া,
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥

আধুনিক কালে আমাদের কবিগুরু সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য। আশা করি তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পরিচরেরা এই

মন্তব্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। অবশ্য তাঁর এই জাতীয় পরিহাসপ্রিয়তার নিদর্শন তাঁর সাহিত্যেও দুর্লভ নয়।

পূর্বে বলেছি হাস্যরসবোধ সকলের সহজাত নয়। যাঁরা হাসবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মান তাঁরা ভাগ্যবান্, হাসতে না পারার মতো দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে? কিন্তু রসিক পুরুষের সাহচর্যে বা রসরচনাচর্চার দ্বারা হাসবার ক্ষমতা অর্জন করাও যায়। এইখানেই হাস্যরসস্রষ্টার সার্থকতা ও গৌরব। মানুষ ও পশুর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে মানুষ হাসতে পারে, পশু পারে না। সুতরাং হাস্য-রসিকরা পরোক্ষে আমাদের একটি মানবিক শক্তি বিকাশেরই সহায়তা করেন। যাঁরা একটা গোটা জাতিকে হাসতে শেখান এবং হাসিয়ে যান তাঁরা সমগ্র জাতিরই পরম বন্ধু। বাঙালিকে যাঁরা দুর্লভ হাস্যসম্পদের অধিকারী করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত নয়। আজ যে বাংলার সাহিত্যাকাশ দশুরুচি-কৌমুদীর আভায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তার অনেকখানি কৃতিত্বই তাঁর প্রাপ্য। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় হাস্যরসের দিক্‌টাও তাঁরই জাদুস্পর্শে এমন বিচিত্রতা ও অজস্রতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর গুপ্তের একটি বিখ্যাত রসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অতি সাধারণ ধরণের কৌতুকরচনার তুলনা করলেই বোঝা যাবে বাঙালির হাসিতে কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের পাঁটাস্তবের দুটি শ্লোক উৎকলন করছি।—

এমন পাঁটার মাংস নাহি খায় যারা<br>
ম'রে যেন ছাগীগর্ভে জন্ম লয় তারা।...<br>
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া<br>
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র এই ক-টা লাইন—

বাংলা দেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে ?
মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কি তোরে ?
লড়াই ভালোবাসিস,—সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে ॥

হাসিতে হাসিতে কত সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকতে পারে, হাসি ও কান্না পরস্পরের কত কাছে আসতে পারে, রবীন্দ্রসাহিত্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাই। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য দিকের ন্যায় এই দিক্‌টারও আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণবিভূতিতে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়, তাই তাঁর হাস্যমহিমার দিক্‌টা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর প্রতিভা ছিল হীরকখণ্ডের মতো বহুমুখী এবং কঠিন, আর হীরকখণ্ডের মতোই তার থেকে নিয়তই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হাসির আভা ঠিকরে বেরোত। যে নিত্যপ্রসন্নতা তাঁর মনে বিরাজমান ছিল, তাঁর মুখে চোখেও তাই প্রতিভাত হত। আর তাই যেন মাঝে মাঝে

সংহত হয়ে তাঁর একেকটি উক্তি থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো বিচ্ছুরিত হত। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্যক্‌ভাবে জানতে হলে তার এই হাস্যোচ্ছলতার দিক্‌টারও আলোচনা হওয়া দরকার। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অপেক্ষাকৃত অনালোচিত দিক্‌টিতে প্রচুর আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

গ্রন্থকার শ্রীমান্ সরোজকুমার বসু সাহিত্যজগতে সুপরিচিত নন। আশা করি অপরিচয়ের বাধা এই গ্রন্থের মর্যাদা নিরূপণের প্রতিকূলতা করবে না। পুস্তকখানির যে-কোনো একটি অংশ পড়লেই পাঠক সমগ্র গ্রন্থখানি পড়বার আগ্রহ অনুভব করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রন্থকার কোনো প্রসঙ্গেই দৃষ্টান্ত উদ্ধারে কার্পণ্য করেননি; এই অকৃপণ দৃষ্টান্তসংকলনের ফলে গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গ হাস্যের দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে। এটা যে শুধু পাঠকের রসবোধকেই জাগ্রত করবে তা নয়, তাঁর বুদ্ধিকেও অলক্ষ্যে বিচারের পথে চালনা করবে। যাঁরা সবত্র গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হতে পারবেন না, তাঁরাও নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের যোগ্যতা স্বীকারে কুণ্ঠিত হবেন না।

গ্রন্থকার আমার প্রাক্তন মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর উন্মেষোন্মুখ সাহিত্যানুরাগ আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। তখনই ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, উত্তরকালে তা আরও নিবিড় হয় যখন তিনি বিশ্বভারতীতে আমার সহযোগী রূপে সাহিত্যগবেষকের কর্ম গ্রহণ করে এখানে আসেন। বর্তমান নিবন্ধটি তৎকালেই রচিত হয়। এই আলোচনায় তাঁর অধ্যবসায় ও সন্ধান-নিষ্ঠার যে পরিচয় পাই তাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করি। অতঃপর তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ নিয়ে অন্যত্র গেলে নিবন্ধটি যথোচিত সংশোধন ও সংযোজন সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ

করি। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন বলে আমি আনন্দিত। এ আনন্দ আমার একারই থাকবে না, আগ্রহী পাঠকমাত্রই তার অংশীদার হবেন, এই আমার বিশ্বাস।

বিশ্বভারতী<br>
শান্তিনিকেতন<br>
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

**প্রবোধচন্দ্র সেন**

# গ্রন্থকারের নিবেদন

শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্র-ভবনে গবেষক হিসাবে কাজ করবার সময় ( ১৯৪৩-৪৪ ) এটি রচিত হয়। শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় শান্তিনিকেতনে এটি পঠিতও হয়েছিল। ঐ সভায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় রচনাটির বিশেষ প্রশংসা করে এবং নানা উৎসাহবাক্যে লেখককে ধন্য করেছিলেন।

কয়েকবছর পরে এটি ধারাবাহিকভাবে 'গায়ত্রী'তে প্রকাশিত হ'তে থাকে ( বৈশাখ, ১৩৫৪—পূজা সংখ্যা, ১৩৫৫ ) কিন্তু নানাকারণে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে কিছুটা পরিমার্জিতরূপে এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা হ'ল।

তত্ত্ব ও রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু আলোচনা এ পর্যন্ত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু তাঁর হাস্যরসাশ্রিত রচনাগুলি সম্বন্ধে কোনো পূর্ণাঙ্গ সার্থক আলোচনা এখনও হয়নি। এর কারণ হয়তো এই যে, তত্ত্ব ও রসের গুরুত্ব বিচারে এই জাতীয় রচনাগুলি আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয় এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার মহনীয়তার সঙ্গে এগুলি যেন খাপ খায়না, এ ধারণা হওয়াও সম্ভব। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে এগুলির মধ্যেও রবীন্দ্র-প্রতিভার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এই শ্রেণীর রচনাগুলিরও ব্যাপক রসপরিচয় প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই নানা অসুবিধা স্বীকার করেও এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হ'ল। এর ফলে যদি রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই রস বিভাগটির দিকে আকৃষ্ট হয় তাহলেই এটির প্রকাশ সার্থক হবে।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একটি চিত্রের অনুকৃতি। অনুকৃতি করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসু। তাঁকে নিছক ধন্যবাদ জানাবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁর এই স্নেহের দান আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

অনুকৃতিটি মুদ্রণের অনুমতি দানের জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাঁর উৎসাহ ও নির্দেশের ফলে এই গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তিনি হলেন রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। ছাত্রহিসাবে আমি নানাভাবে তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছি। এই গ্রন্থের ভূমিকা তাঁর এই স্নেহেরই নিদর্শন।

সাহিত্যরসিক এবং কথাসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার দে-র কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ। 'গায়ত্রী' পত্রিকাতে এটির অংশবিশেষ যে প্রকাশিত হয়েছিল, সে তাঁরই উৎসাহে। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি পিছনে না থাকলে এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

বিনীত

রাঁচি, ১লা আষাঢ়, ১৩৫৭ — **গ্রন্থকার**

# সূচী

# সংশোধনী পত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২ | ১ | সিগ্ধ | স্নিগ্ধ |
| ২ | ১১ | মহত্ত্বের | মহত্ত্বের |
| ৩৪ | পাদটীকা হবে— | | |
| | ১ 'তাসের দেশ' নাটিকা থেকে। | | |
| ৩৭ | ৪ | বাঁশরি | বাঁশরী |
| ৩৭ | ১৩ | অসিষ্ণুতার | অসহিষ্ণুতার |
| ৩৭ | ২৩ | স্বার্থক | সার্থক |
| ৩৮ | ১ | বাশরি | বাঁশরী |
| ৪৫ | ২৩ | বেতে | যেতে |
| ৫৩ | পাদটীকা হবে— | | |
| | ১ এই নামে প্রকাশিত গল্পের নাট্যরূপ। | | |
| ৫৬ | পাদটীকা হবে— | | |
| | (দ্বিতীয় উদধৃতিটি) ২ 'জীবনস্মৃতি'—১৭৭ পৃষ্ঠা। | | |
| ৬৭ | ৩ | পণ্ডিস্মন্য | পণ্ডিতন্মন্য |
| ৮০ | ১৭ | সরল | সরস |
| ৮০ | ২৪ | ইষ্ণু | ইক্ষু |
| ৯০ | ৫ | বুনা বুলবুলি | বুগ বুলবুলি |
| ৮৬ | ৯ | ব্যাংগার্থ পূর্ণ | ব্যঙ্গার্থ পূর্ণ |

# রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস

## ( ১ )

(ক) রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভাকে দীপ্ত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত স্ফটিকখণ্ড থেকে যেমন বিচিত্র ধরণের রশ্মিমালা বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তেমনি অপূর্ব প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোক স্পর্শে কবির মানসস্ফটিকে কত বিচিত্র ভাব ও চিন্তার রসরশ্মির সৃষ্টি হয়েছে। তাতে আমরা যে শুধু মুগ্ধ হয়েছি তা নয়, সেই প্রতিভাধারার নানা রসসঙ্গমে অবগাহন করে আমাদের রসপিপাসু চিত্ত স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি—কিন্তু তাঁর প্রতিভার এই বিচিত্র বহুমুখীনতা তাঁর সৃষ্টিকে সাহিত্য জগতের নানা বিভাগে বিস্তৃত ও প্রসারিত করে রেখেছে, রসজগতের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রকৃতির সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে। তাই তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন চরমতম লিরিক কবিতার উচ্চ ভাব মাধুর্য ও উপলব্ধির গভীরতায় বিস্ময়ান্বিত হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি রসমধুর প্রহসন ও নির্মল ব্যঙ্গ রচনার অন্তরাল-স্থিত হাল্‌কা হাসির মৃদু ঝংকারে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসবা'র সুযোগ ও সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা হিমালয়ের বক্ষনিঃসৃত গঙ্গোত্রীর

সিগ্ধধারার মত সেই ভাবগম্ভীর মহান পুরুষের হৃদয়নিঃসৃত হাস্যমধুর ও ব্যঙ্গকটাক্ষ উজ্জ্বল রসরসিকতার পরিচয় পেয়ে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছেন। নর নারী নির্বিশেষে এবং বয়সের বাঁধা এড়িয়ে সকলকেই 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' এই বিশেষ গুণের প্রসাদ দানে ধন্য করেছেন। অন্যপক্ষে ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ যাদের সম্ভব হয়নি তারাও তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই এই আপাত-অপ্রত্যাশিত রস পরিচয়ের দাবী করতে পারেন।

অবশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় রসিক পাঠক সম্প্রদায়ের নজর এড়িয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্বের তুলনা অনুসরণ করে বলা যায় যে আপাত দর্শনে হিমালয়ের বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এই মহত্বের ও কাঠিন্যের অন্তরালে যে স্নিগ্ধসলিলা প্রস্রবণের বাস, তা সহসা চোখে পড়েনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার বিশালতা ও মহনীয়তাও তাঁর রসরচনাগুলিকে ঠিক এই ভাবেই সহসা চোখে পড়তে দেয়না। তাঁর সাহিত্যে হাস্যরসেরও যে প্রচুর ও বিচিত্র অবকাশ রয়েছে তা সাধারণতঃ সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কাব্যের গৌরব তাঁর হাস্য রসসৃষ্টির পরিচয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কাব্য সৃষ্টির মহান আদর্শের দিক দিয়েই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধানত চিত্তে বিচার করে থাকি। হাস্যরস রচনার মধ্যেও যে তাঁর প্রতিভা একটি সুন্দর রসপরিবেশের সৃষ্টি করেছে এবং এই শ্রেণীর সাহিত্য রচনার ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহনীয়তারও যে কিছুমাত্র হানি হয়নি, একথা আমরা অনেক সময়েই বুঝে উঠতে পারিনা।

কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই হাস্যরসরচনাগুলিও একটা অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছে এবং এ ক্ষেত্রেও রসের উৎকর্ষ সৃষ্টির প্রাচুর্য ও

রচনার বৈচিত্র্যে তিনি বিশিষ্ট গৌরব লাভ করেছেন। পূর্বতন এবং সমসাময়িক মূলতঃ হাস্যরসিক সাহিত্যস্রষ্টাদের পক্ষেও তার এই বিশিষ্টতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ এই পরম উপভোগ্য হাস্য-রসাশ্রিত রচনাগুলি সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য।

(খ) রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠ আভিজাত্য। বাংলা সাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন সে যুগকে যে আমরা আজ বহু পশ্চাতে ফেলে আসতে পেরেছি, সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শকে যে আজ আমরা আমাদের অতি নিকটেই পেয়েছি তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও অনন্যকরণীয় রচনাসৌষ্ঠব এবং সেই সঙ্গে তার রসবোধের আভিজাত্য। সাহিত্যের যুগাদর্শ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, কোনো একটা বিশেষ আদর্শ তাঁকে কখনও পশ্চাতে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। এই আত্মনিষ্ঠ চলিষ্ণুতা তার অন্যান্য রচনার মত হাস্যরচনাগুলিকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং তাঁর এই আভিজাত্য তাঁকে আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা ক'রে রসের মর্যাদা বজায় রেখেছে।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে হাস্যরসের যে আদর্শ বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত মনের খোরাক জোগাচ্ছে, তার মূলে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্টই। ঈশ্বর গুপ্তের কাল পর্যন্ত যে শ্রেণীর হাস্যরস আমাদের সাহিত্যে একাধিপত্য করছিল, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে তার আবেদন বেশী নয়। সে যুগের সাহিত্যে হাস্যরস কোথায়ও যথার্থ রস হয়ে উঠবার বিশেষ সুযোগ পায়নি। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যেগুলি ছিল নিছক ভাড়ামি তাকেই অনেক সময় সাহিত্যের দরবারে হাজির করা হোত ভাষার পোষাক

পরিয়ে, কোথায়ও আবার নিছক গালাগালিকেই হাস্যরসের উৎস বলে মনে করা হোত—তাই স্বভাবতই এতে বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর গুপ্ত এই আদর্শকে খানিকটা মার্জিত করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও এই রসের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। অনুদার ব্যঙ্গবিদ্রূপকেই তিনি হাস্যরসের প্রধান বাহন বলে ধ'রে নিয়েছিলেন। স্থানে স্থানে নিছক রঙ্গরসের নিদর্শন তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে রঙ্গ রসবিচারে নিম্ন পর্যায়েই পড়ে, এতে বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই আমরা প্রথমতঃ নির্মল হাস্যের সন্ধান পাই এবং "তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয়না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্ট রূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।"[১] আধুনিক কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, হাস্যরসের একটা নতুন দিককেই আমরা তার রচনায় দেখতে পাই। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ই যে এই আদর্শ পরিবর্তনের মূলে অনেকটা কাজ করেছিল একথা বলা যায়। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই হাস্যরসমূলক রচনা বলে সাহিত্যের যে একটা নতুন রসবিভাগ—তাকে সকলে যথোচিত মর্যাদা দিতে আরম্ভ করেন। রসের জাত বিচারে হাস্যরসকে কেউ আর অপাংক্তেয় করে রাখতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ এই রসবিভাগকে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আরও মার্জিত ও বিচিত্র করে

১ আধুনিক সাহিত্য—'বঙ্কিমচন্দ্র'

তুললেন। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত এখানেও তিনি তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেছেন।

(গ) প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুসারে হাস্য রসের নানা শ্রেণী বিভাগ করা যায়। ইংরাজীতে Wit, Humour, Comic, Satire ইত্যাদি বিভিন্ন নাম পরিচয়ে এই শ্রেণী বিভাগকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে Wit এবং Humourই প্রধানতঃ প্রকৃষ্ট হাস্যরসের মূল উপজীব্য।

Wit বুদ্ধির বিদ্যুৎ চমক—আকস্মিকতার আঘাতে জগতের ও মানুষের যত কিছু জড়তা পঙ্গুতা ও হাস্যকর মূর্খতাকে আঘাত করাই Wit-এর লক্ষ্য। Wit-এর আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে। "Wit may be described as spiritual lightning—sparks of wit clear our mental atmostphere and reveal the disconcerting character of all that is stupid and heavy, inert or mechanical in men and manners."[১] এই Wit-এর আতিশয্যই Satire -এর রূপ গ্রহণ করে। Wit -এর মধ্যে ঝাল আছে কিন্তু আঘাত নেই, Satire-এ আঘাতের তীব্রতাই প্রধান।

Humour-এর আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছেই বেশী। জগতের ও মানুষের যত কিছু অসংগতি ও অযৌক্তিকতা আমাদের মনে যে ক্ষমাশীল হাস্যের উদ্রেক করে, সেই আঘাতহীন নির্মল হাস্যই humour এর দান। "Humour betrays an attitude of amused tolerance of the comic aspect of life and things.

---

১ P. Choudhury—Rabindranath's wit & humour, V. B. Quarterly, Tagore Birthday Number P 115

It is more human than wit and appeals to our whole mind, both emotional and intellectual."[১]

প্রকৃষ্ট হাস্যরসের মধ্যে এই wit ও humour-এর এক চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। বুদ্ধি ও হৃদয়কে নিয়েই মানুষের যত কিছু সৃষ্টি, এই দুইএর সংযত সামঞ্জস্যই সৃষ্টিকে সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস রচনার মূলে আমরা এই দুইটি ধারাকেই সুন্দর সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হতে দেখি।

( ২ )

( ক ) রবীন্দ্র-সাহিত্যে satire-এর স্থান কিছুটা গৌণ। সাময়িক কোনো কোনো ঘটনা প্রবাহ বা অসহনীয় কোনো সামাজিক কুপ্রথা স্পর্শকাতর কবিচিত্তে বিক্ষোভ না তুলে পারেনি। বিশেষতঃ তাঁর কাব্যজীবনের প্রথমযুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যৌবনসুলভ অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রথমযুগের কয়েকটি রচনায় আমরা তাঁর লেখনীর আঘাতে সুতীব্র ব্যঙ্গরস সৃষ্টি হতে দেখি। অবশ্য তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যবোধ এখানেও তাঁকে আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

১২৯০ সালে শশধর তর্কচূড়ামনি তার নবধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন। এই সময় থেকেই এই নব্য-হিন্দুধর্মের সমর্থক ও পরিপোষকদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধের সূত্রপাত হয়। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষে আক্রমণও এই সময় আরম্ভ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ এই দলাদলির বিরোধ থেকে

---

১ P. Choudhury—Rabindranath's wit and humour, (V. B. Qly) Tagore Birthday Number, P 115

বাইরে ছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ তিনিও এই বিক্ষোভের মধ্যস্থলে এসে পড়লেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রে সুতীব্র ব্যঙ্গের কশা হস্তে তিনি সাক্ষাৎভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

বিপক্ষদলের পত্রিকা ও সুযোগ্য লেখক চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে তাঁর সুতীব্র ব্যঙ্গ প্রথম প্রকাশ পেল 'দামু ও চামু'[১] নামক কবিতায়!

"দামু বোসে চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড়ই ফেনিয়েছে
আমার দামু আমার চামু।
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম
মেছুনি সংহিতার ব্যাখ্যা
হিন্দুর ধরম।
লিখছে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল।"

কিন্তু এ পক্ষ থেকেও গালি-গালাজ কিছু কম করা হয়নি। বাজার সরগরম রাখবার প্রচেষ্টায় এরাও পিছপা নন।

"এমন হিন্দু মিলবে নারে
সকল হিন্দুর সেরা
বোস বংশ, আর্য-বংশ
সেই বংশের এঁরা।

---

১ কড়ি ও কোমল, ১ম সং

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিন্দু-শাস্ত্রের মূল
মেলাই কচুর আমদানীতে—
বাজার হুলুস্থুল।

স্থানে স্থানে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মাত্রা ছাড়িয়েও গেছে।

'ভবিষ্যৎটা শিখলেনাক—
বাপের শিক্ষাদোষে'।

এরও কিছু পরে লিখিত এক পত্রকবিতাতে[১] তিনি এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ধারাকে বজায় রেখেছেন। নব্য-হিন্দুদের অতি উৎসাহ লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন,—

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিভের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তারা বলে 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিগুজি।
পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার
বঙ্গদেশে মেলাই এলো বরা অবতার।
দাঁতের জোরে তুলবে তারা হিন্দুশাস্ত্র পাঁকের থেকে
দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত খিচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়া মিথ্যে কথা, মিথ্যাবাদীর কোলাহল,
জিভ নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।"

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই জাতীয় রচনাগুলিতে যুক্তিতর্কের কোনো বালাই নেই। তীব্র বিদ্বেষ সঞ্জাত ব্যঙ্গের ছলে নিছক গালাগালিতে প্রতিপক্ষকে কোনো প্রকারে কাবু করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

১ কড়ি ও কোমল

হাস্যরস সৃষ্টির যে প্রাচীন পদ্ধতি একসময়ে আমাদের সাহিত্যে আধিপত্য করছিল এখানে রবীন্দ্রনাথ তার হাত এড়াতে পারেননি। সুখের বিষয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার পরিচয় বেশী নেই।

( খ ) 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাও এই সময়ের। এর অন্তর্গত কতকগুলি রচনা নিছক হাস্যরস বা humour-কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কতকগুলি রচনাতে ব্যঙ্গরসই প্রাধান্য পেয়েছে। এই ব্যঙ্গরচনাগুলিতে প্রচলিত কোনো বিধিব্যবস্থা বা সংস্কারকে আঘাত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে বিদ্বেষবাষ্পের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। এগুলি প্রকৃষ্ট হাস্যরসিকের নির্মল মন নিয়ে লেখা।

সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি যে নিতান্ত করুণা পরবশ হয়েই আমাদের দেশে অনেক কষ্ট সহ্য করেও বাস করছে এবং সে যে শুধু আমাদেরই উন্নতির জন্য, একথাটা তাদের অনেক প্রতিনিধিই জোর গলায় অনেকবার বলেছেন। এই অসার আন্তরিতা ও নির্লজ্জ মিথ্যাকে রবীন্দ্রনাথ 'ডেঞ্চে পিপড়ের মন্তব্যে'র মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন। ডেঞ্চের মুখ দিয়ে ইংরেজের এই মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'পিঁপড়েরা ( অর্থাৎ ভারতবাসীরা ) নিজের শর্করা খেতে ও নিজের বিবরে বাস করতে চায়—তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে'। কিন্তু ডেঞ্চেরা তাদের এই অবনতি (?) কি করে সহ্য করে! তাই তারা পণ করেছে, 'আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব। আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগনে, ভাইঝি, ও শ্যালকবৃন্দ।" কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে নিরীহ পিঁপড়েদের শর্করা ডেঞ্চেরা কেন খাবে, ডেঞ্চেরা অমনি সগর্বে উত্তর দেবে. "তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেঞ্চে।

দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থভাবে পিঁপড়েদের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছি। ……পিঁপড়েরা যদি আপত্তি করে—তবে তাদের বলব অকৃতজ্ঞ।"

ইংরেজের এই নিঃস্বার্থ পরোপকার ইচ্ছার অত্যাচারকে—'ধৈর্য ধরে' সমর্থন করাই ভারতবাসীর কর্তব্য! কারণ, '(পিঁপড়েদের) ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, ডেঞ্চেদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমেই তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে।'

'পয়সার লাঞ্ছনা'-তে এই ব্যঙ্গ ইঙ্গিত আরও স্পষ্টতর ও তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে। সাদা চামড়া ও কালোচামড়ার মধ্যে যে প্রভেদ সর্বক্ষেত্রে অতি সযত্নে মেনে চলা হয়, তার তীব্র প্রতিবাদ এবং এই কৃত্রিম পার্থক্যের অসারত্ব দেখানই এর উদ্দেশ্য।

এই কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা ইঙ্গবঙ্গীয়দের। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও তারা তাদের মনকে ও চোখকে সর্বদাই ফিরিয়ে রেখেছে ইংলণ্ডের দিকে। ইংরেজের সঙ্গে একাসনে বসা এবং আত্মীয়তা স্বীকারই তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। 'কালা আদমি'দের সঙ্গ তাদের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য,—"গিনিমোহরের সহিত সিকি দুয়ানি এক সাম্যসীমার অন্তর্গত কিন্তু তাই বলিয়া সিকি দুয়ানির সহিত পয়সা! কখনোই নহে।" মাটির নীচে জন্মক্ষেত্রে উভয়ের পদমর্যাদা সমান থাকলেও সিকি দুয়ানিরা যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বলতে চায়—"পয়সার সঙ্গে সর্বতোভাবে আমরা পৃথক হইতে চাহি, কারণ উহারা বড়ই হীন।" তাছাড়া "উহারা তাম্রবর্ণ" এবং "উহাদের গন্ধ ভাল নহে।" শ্বেতচর্মের এই যে কৌলীন্যগর্ব, এর মত অসার কৃত্রিমতা সমাজে আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। ধারকরা ময়ূরপুচ্ছধারী-দের এই ইংরেজঘেসা স্বকপোলকল্পিত আভিজাত্য আপাত কার্য্যকর হলেও একদিন এর অসারত্ব ধরা পড়েই। অনেক আধপয়সাও রঙ

মেখে আধুলি সেজে সতেজে গলাবাজি করে বেড়ায় কিন্তু তার জন্মগত আওয়াজ ও গন্ধ এই মেকী আবরণে ক'দিন ঢাকা থাকে! এইভাবে গায়ে পারা মেখে সাদার ভূয়ো গৌরব লাভ করার চেয়ে "পারা খাইয়া মরা ভালো"—এ শুধু লেখকের অভিমতই নয়, পাঠকদেরও বটে।

'কথামালার নূতন প্রকাশিত গল্পের' মধ্যে প্রবল দুর্বলের যে চিরন্তন বিরোধ এবং ফলে দুর্বলের উপর সবলের যে অবশ্যম্ভাবী অবিচার ও অত্যাচার, তাকেই রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। "অনবধান বশত যদি হুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড় পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।"—সুবিচারের এই চমৎকার প্রয়োগপদ্ধতি বাস্তবজীবনে অহরহই চোখে পড়ে এবং চিন্তাশীল এবং হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই মন এই যুক্তিহীন বিচারের প্রহসন দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দুবলের প্রতিবাদ শুধু অরণ্যে রোদন মাত্রতেই পর্যবসিত হয়, সবল নিশ্চিন্তে তার "বিচারের নির্মম কুঠারে শাণ দিতে থাকে।"

বর্তমান জগতের সর্বত্রই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ ক্রমাগত বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।[১] শাসিতের রক্তাক্ত হৃদয়ের উপর দিয়েই শাসকের উপভোগের রথ সশব্দে ও সদম্ভে এগিয়ে চলে। দুর্বলের আর্তনাদ শাসনব্যবস্থার সুবন্দোবস্তে ভোগবিলাসের চক্রধ্বনির নীচে চাপা পড়ে যায়। আত্মসুখমগ্ন রাজশক্তি যেখানে দূরে দূরে থাকে, প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষ থাকেনা, সেখানেই রাজ অনুচরদের বিকৃত মনোবৃত্তির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিচারের নাম দিয়ে তখনই সুরু হয় অবিচারের ক্রূর অত্যাচার। রক্ষকের বাহু

১ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের কথা

ভালোমানুষির অন্তরালে তখনই ধীরে ধীরে ভক্ষকের সত্যরূপ বেরিয়ে পড়তে থাকে। শাসন ব্যবস্থার এই যে প্রহসন, যার অন্তর্নিহিত তিক্ততার সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য অল্পবিস্তর আমাদের প্রায় সকলেরই হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই চরম বিদ্রূপ করেছেন 'রাজা ও রাণী'র ভিতর দেবদত্তের মুখ দিয়ে। "( রাজকার্যে অমাত্যের ) দৃষ্টি নাই, সে কী কথা ! বিলক্ষণ আছে ! গৃহপতি নিদ্রাগত, তাই বলিয়া গৃহে চোরের কি দৃষ্টি নাই ? সে যে শনিদৃষ্টি···" এই দৃষ্টির ফলেই প্রজাদের —

"যত উপসর্গ ছিল অন্ন বস্ত্র আদি
সব গেছে, আছে শুধু অস্থি আর চর্ম"

আর সবচেয়ে সাংঘাতিক এই অমাত্যদের ছদ্ম ব্যবহার,

"মুখে লেগে আছে বাপু বাছা,
আড়চোখে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহা কিছু হাতে ঠেকে
যত্নে লন তুলি"······

নিতান্ত ক্ষোভের সঙ্গেই দেবদত্ত বলেছে,—

"দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার,
আজো তার অনশন হোলো না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য !"

শাসক ও শাসিতের এই তিক্ত সম্বন্ধ প্রসঙ্গে আর একটি প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীতে প্রকাশিত ( জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ ) 'জুতাব্যবস্থা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকলেও রচনা

পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং আরো নানাকারণে এটি যে তাঁরই রচিত এ বিষয়ে অনেকেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।[১] আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত যে কেউই নির্বিচারে ও নির্বিবাদে একটা সমগ্র জাতিকে অপমান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। ইংরেজী কাগজওয়ালারা তাদের বর্ণগৌরবে অন্ধ হয়ে নানাক্ষেত্রে তাদের অপরিসীম ঔদ্ধত্য ও ঘৃণ্য নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় দিত। Indian Mirror পত্রিকায় একদিন মন্তব্য দেখা গেল যে "This evening's English Man has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "Kick them first and then speak to them"—এই ঘটনাকে অবলম্বন করে অপমানক্ষুব্ধ কবিচিত্ত তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল 'জুতাব্যবস্থা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"গভর্ণমেণ্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন যে যেহেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালী কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।" পাদটীকায় মন্তব্য দেখা গেল…"আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাসমাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন

---

১ রবীন্দ্র-জীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—…রচয়িতার নাম না থাকিলেও উহা যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কমই।"

রবীন্দ্রজীবনী, ( ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯ )

হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।" লক্ষ্য করা দরকার যে এই প্রবন্ধটিতে রসরসিকতার বাষ্পমাত্র নেই, সুতীব্র ব্যঙ্গের আঘাতেই এটি প্রাণবন্ত।

সাহিত্য সমালোচনার নামে প্রকাশিত অনেক অদ্ভুত হাস্যকর প্রলাপ অনেক সময় লেখকের পক্ষেই বিশেষ বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য সরস্বতীর মন্দিরের সদর দেউড়ীর এই সব অর্বাচীন পাহারাদার সাহিত্য রস বিচারের নামে আভ্যন্তরীণ গূঢ় অর্থ বের করতে বসে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি করে থাকেন। 'রসিকতার ফলাফল'[১]-এ এই জাতীয় পণ্ডিতম্মন্য অর্থগৃধ্নুদের চমৎকার ব্যঙ্গচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচকের অপূর্ব প্রতিভা একই রচনার ভিতর থেকে ফরাসডাঙ্গার তাঁতিদের দুঃখ ঘোচান, পাটের আবাদ, চাষাদের উন্নতি, বালবিধবাদের দুঃখ, এমন কি খ্যাপা কুকুরে কামড়ানোর প্রতিকার পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই সন্ধান পেয়েছে। অনেকে আবার একে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, ফলে রসিকতা করতে গিয়ে লেখকের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। নিরুপায় লেখকের কণ্ঠ থেকে করুণ সুরে বারবার এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে, "আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না!" 'অরসিকেষু' রহস্য নিবেদনের ফল এমনিই হয়ে থাকে।

প্রত্নতত্ত্ব'[২]-তে আধুনিক গবেষণার নামে অর্থহীন প্রলাপের যে যথেচ্ছাচার চলছে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই অপূর্ব রসরচনার ভিতর দিয়ে

---

১ ব্যঙ্গকৌতুক
২ ঐ

ব্যঙ্গের মৃদু যষ্ট্যাঘাত করেছেন, যদি এতে করে তথাকথিত গবেষক শিরোমণিদের কিছুমাত্র চৈতন্য হয়! গবেষণার নাম ক'রে একদিকে শুধু বড় বড় কথার অর্থহীন জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায়ই 'ধান ভানতে শিবের গীত' এসে পড়েছে, অন্যদিকে একদল আবার যুক্তিতর্কের ধার বিশেষ না ধেরে নিজেদের গবেষণালব্ধ অতীত গৌরবের নেশায় মসগুল! তাদের বাদপ্রতিবাদের ভাবা অনেকটা এই রকম,—"আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার সহিষ্ণু জাত আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা নাপিত রোধ!"—এর মধ্যে নব্যহিন্দু সমাজের ধ্বজাধারীদের প্রতি কিছুটা বক্রোক্তি আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

'হিং টিং ছট্'[১] নামক সর্বপরিচিত কবিতাটিতেও এই জাতীয় ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্র ব্যাখ্যার নামে সহজ জিনিষকে জটিল করে তোলার যে অদ্ভুত আর্ট এক সময় আমাদের সাহিত্য ও বক্তৃতাদিতে প্রকাশ পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যঙ্গ না করে পারেননি। বড বড় গালভরা বুলি দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করবার যে প্রচেষ্টা এবং অজ্ঞানতাকে ঢাকবার জন্য যে অর্থহীন উচ্চ গলাবাজি তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হাস্যোদ্রেক হয়। এই সব অতি পণ্ডিতদের বর্ণনা—

"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়"।

এবং সেই সঙ্গে অবিনয় ও ঔদ্ধত্যের যে পরিচয় এবং পরিণামে বহু

[১] সোনার তরী

পুরাতন ভাবের অতি সরল ও পরিষ্কার অর্থের যে নব আবিষ্কার তা শুনে এই জ্ঞানলাভই হয়ে থাকে যে—

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবেনা ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।

*        *        *        *

সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

এখানেও নব্যহিন্দুধর্মের অতি উৎসাহী সমর্থক ও ব্যাখ্যাতাদের প্রতি কিছু ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। শিক্ষা পদ্ধতির নানা ত্রুটি ও অব্যবস্থার ফলে কোমলমতি শিশুদের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার যে গুরুভার দিনে দিনে তাদের দৈহিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যকে ডেকে আনে তা তাঁর চোখ এড়ায়নি। "প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ"[১]-এর মধ্যে এই পাঠ্য ব্যবস্থাকে তিনি চরম ব্যঙ্গ করেছেন। দেবী সরস্বতী বলছেন, "শিশুদের পাঠের জন্য আজকাল যে সকল পুস্তক নির্বাচিত হয়, সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙিয়া পড়ে।…অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক।"

কিন্তু যমরাজও "তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, আমাকে কোনো প্রয়োজন নাই, ইস্কুলের মাষ্টার ও ইনস্পেক্টর আছে।"…

---

[১] ব্যঙ্গ কৌতুক

এবং "শিশুশিক্ষা বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোনো মতভেদ রহিল না।" এ বিষয়ে অন্য মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও ব্যবহারিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও যুক্তিহীন বিধি ব্যবস্থার যে অত্যাচার, উপরোক্ত রচনাটিতে তার দিকেও লেখক কটাক্ষ করেছেন। বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক ও হৃদয়গত বন্ধন অপেক্ষা অর্থের দাবীদাওয়ারই প্রাধান্য বেশী। "টাকা নামক একটি চক্রমুখো হঠাৎ-দেবতা" "বিবাহ ডিপার্টমেন্টে" কন্দর্পের কাজ "কাড়িয়া লইয়াছে"। তাই নিতান্ত দুঃখে কন্দর্পের বিনীত প্রার্থনা "উক্ত ডিপার্টমেণ্ট হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবলশক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক।"

'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক'[১]-এর মধ্যেও সমভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানেও প্রজাপতি বলছেন,—"আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নির্জীব—তিনি পঞ্চশর নিয়ে যখন আস্ফালন করতে যান তখন তীরগুলো ঠিকরে যায় কোম্পানীর কাগজ-নির্মিত বর্মের পরে।"

আধুনিক যুগে অতিবুদ্ধি মানুষ যে যুক্তিবিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পদে পদে দেবতাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে 'খোদার উপর খোদকারি' করতে প্রস্তুত, রচনাটিতে তারও প্রতি কটাক্ষ আছে। দেবতারা বর্তমানে "এন্থ্রপলজি নামক অর্বাচীন ম্লেচ্ছ শাস্ত্রের বাল্যলীলা পর্বেই আশ্রয় পেয়েছেন। এবং বর্তমান মানুষের "পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পা'ও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশী সজীব।"

'হাস্যকৌতুক' এর অন্তর্গত 'আর্য ও অনার্য' নামক রচনাটি নব্য

[১] ব্যঙ্গ কৌতুক

হিন্দুয়ানী ও নব্য আর্যধর্মের যে ঢেউ একসময়ে বাংলাদেশে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তারই বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ব্যঙ্গরূপ মাত্র। "ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতন গজিয়ে ওঠে" ইত্যাদি কবিতাটি যে সময়ে রচিত এটিও তৎসাময়িক রচনা এবং এটিকে এক হিসাবে ঐ কবিতারই মার্জিত গদ্যরূপ বলা যেতে পারে। শশধর তর্ক-চূড়ামণি হিন্দুসমাজের প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যবহারিক সংস্কারের যে হাস্যকর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন এর মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।'চিন্তামণি কুণ্ডু' শশধর তর্কচূড়ামণিরই ব্যঙ্গ প্রতীক। আর্যদের হাই তোলবার পূর্বে তুড়ি দেবার মূলে এবং তেল মাখবার পূর্বে মাটিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ হিসাবে ম্যাগ্নেটিজমের অস্তিত্ববোধ, চিন্তামণিবাবুর অপূর্ব প্রতিভাপ্রসূত চিন্তারই ফলমাত্র। কিন্তু এই অপূর্ব জ্ঞান আহরণ করবার জন্য তাকে বিজ্ঞান শিখতে হয়নি, কারণ তিনি শুধু মাত্র নিজের "চিন্তাশক্তির প্রভাবেই আমাদের আর্যজাতির হাঁচি-কাশি, তুড়ি, আঙুল মট্‌কানো প্রভৃতি আচার ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছেন।" তিনি শপথ করে বলতে পারেন যে তিনি আর্যশাস্ত্র কিংবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিছুই পড়েননি, "সমস্ত বিদ্যাই তার স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত।" অর্থাৎ এ সমস্তই তার উর্বর মস্তিষ্কের অপূর্ব ফসল!

কল্পনার 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতাটির অংশবিশেষে এই ব্যঙ্গ আরো তীব্রতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

> "পণ্ডিত ধীর মণ্ডিত শির
> প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা,
> নবীন সভায় নব্য উপায়ে
> দিবেন ধর্ম দীক্ষা।

কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি, আর
শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।"

এই সব দেখে শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়—

"তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের —
অন্ততঃ গ্যানোখণ্ড",

কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়—

"কিছু না, কিছু না, নাই জানাশোনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি।" ইত্যাদি

দুইটি রচনার ভাবগত ও লক্ষ্যগত মিল সুস্পষ্ট। নব্য হিন্দুধর্ম ও নব্যবিজ্ঞান প্রচারকদের অর্থহীন আত্মম্ভরিতাকে আঘাত করাই উভয় রচনার উদ্দেশ্য।

গুরুবাদের মোহ অনেকক্ষেত্রেই আমাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আমাদেরকে জড় পুত্তলিকার মতো আড়ষ্ট ও পঙ্গু করে তোলে। অসংখ্য অর্থহীন কুসংস্কার এবং হাস্যকর সমস্যা ও তার অদ্ভুত সমাধানের অকারণ বোঝায় আমাদের ব্যবহারিক জীবন অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সর্ববিধ যুক্তি তর্ককে অগ্রাহ্য করে

আমরা অন্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে থাকি এবং এরই সুযোগে অর্বাচীন শিরোমণি'র দল আসর জাকিয়ে বসে। এই হীন আত্মঘাতী মোহকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের মৃদু কশাঘাত করেছেন হাস্যকৌতুকের 'গুরুবাক্য' নামক রচনায়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কঠিন সমস্যার নমুনা—"আমার নাম কার্তিক, আমার ছোটো শালার নাম কীর্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারে কিনা এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা বেটার নাম কীর্তিবাস;—এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার স্ত্রী যদি কীর্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তাহলে বৈধ হবে কিনা।"

প্রগতিবাদী মহিলা সমাজকে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে বিকৃত হাস্যরস-সৃষ্টির যে অপচেষ্টা একসময়ে আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল, হাস্যকৌতুকের 'রসিক' রচনাটিতে তাকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বিকৃত রুচিপূর্ণ ভাড়ামিই যে সেই যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যরস হিসাবে সম্মান পেত, রচনাটিতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে বলা যায়।

সামাজিক বদ্ধ সংস্কারের আওতায় সৃষ্ট যে সমস্ত অর্থহীন কুপ্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে নানা অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের বোঝা দিন দিন বাড়িয়ে চলছিল, যুক্তিবাদী কবিচিত্তে তাতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে কয়েকটা ব্যঙ্গ রচনার ভিতর দিয়ে।

বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথা ধর্মসংস্কারের বিচারে খুব মহনীয় বলে বর্ণিত ও চিত্রিত হলেও এর ভিতর একটা ন্যায়হীন সংস্কারের

অত্যাচারের যে ট্যাজেডি রয়েছে তাকেই অনবদ্য কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গরসের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে "নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ"[১] কবিতায়। একদিকে নব বিবাহিত যুবক স্বামীর আকুল আগ্রহ নিয়ে গদ্‌গদ্‌ ভাষায় প্রেম নিবেদনের আপ্রাণ বৃথা চেষ্টা, অন্যদিকে বালিকা বধূর স্বাভাবিক শিশুসুলভ আলাপ ব্যবহার—বাল্য বিবাহের পরিণাম এই পারিবারিক serio-comedy-ই ব্যঙ্গরসের উদ্বোধন করেছে। নিরালা কাননে উপবিষ্টা বালিকা বধূকে দেখে যুবক স্বামী যখন অনেক আশা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করিছ বসি কুঞ্জ ভবনে", তখন সমস্ত আশা আকাংখাকে সলিলস্থ এবং প্রেম ও কাব্যকে সমাধিস্থ করে উত্তর এল—"খেতেছি বসিয়া টোপাকুল" এবং এরই উপসংহারে নাছোড়বান্দা ব্যাকুল স্বামীর একান্ত প্রার্থনা—"তোমা তরে সখি বল করিব কি" এর উত্তরে বালিকা-বধূ গম্ভীর প্রসন্ন আননে হুকুম করলেন—"আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়!" এ সম্বন্ধে অন্য মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

এই প্রসঙ্গে 'গোলামচোর' (ভারতী, ১২৮৮) প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিকে লেখক রসিকতার শর্করামিশ্রিত ব্যঙ্গের মৃদু আঘাত করেছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ অনেকাংশে লটারীতে ভাগ্যপরীক্ষার মত। বিবাহের পূর্বমুহূর্তেও হয়ত পাত্রপাত্রী পরস্পরের কিছুমাত্র পরিচয় জানে না! এই ভাবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার ব্যবস্থাকে লেখক গোলামচোর খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

---

১। মানসী

"আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালীর মত গোলামচোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই।"

ধর্মের নাম নিয়ে যে উৎকট অন্ধ উন্মত্ততা স্বাভাবিক সুস্থ বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষকে পশু করে তোলে, তা রবীন্দ্রনাথের যুক্তিশীল মনের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি এবং কতকগুলি ব্যঙ্গ কবিতার ভিতর দিয়ে তিনি ধর্মের বুলির অন্তরালে যে ভণ্ডামি ও বর্বরতাকে আমরা অনেক সময়ই প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, তাকে তীব্র আঘাত করেছেন। ধর্মের আড়ালে পাশব হীনতার যে প্রবৃত্তি তাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি।

'ধর্মপ্রচার'[১] কবিতাটিতে এই ব্যঙ্গ তীব্রতম জ্বালাময় রূপ নিয়েছে। হিন্দুধর্মের অন্যতম মূল আদর্শ পরধর্মসহিষ্ণুতা। উৎকট আর্যামির উত্তেজনায় হিন্দুধর্মধ্বজাধারীরা এই আদর্শকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অন্যধর্ম-প্রচারকদের প্রতি দলবদ্ধ গুণ্ডামিকেই স্বধর্মরক্ষার উপায় বলে ধরে নিয়েছিল।

"তবে রে লাগাও লাঠি,
কোমরে কাপড় আঁটি,
হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খ্রীষ্টানি হোক মাটি'—"

এই কয় পঙ্‌ক্তিতেই এই জাতীয় ধার্মিকদের ধর্ম-আদর্শ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই ধর্মবীরদের শেষ পরিণাম বড়ই করুণাব্যঞ্জক!

"পুলিস আসিছে গুঁতা উচাইয়া
এই বেলা দাও দৌড়!
ধন্য হইল আর্যধর্ম, ধন্য হইল গৌড়।"

---

১ মানসী

এই অপরিসীম বীরত্বের জের অবশ্য এখানেই মেটেনি। ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরে এসে তাদের মুখে পারিবারিক বীরত্বের বুলি ফুটেছে—

"এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি,
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী করে বসি।
স্বামী যবে এলো যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা,
আর্য্যনারীর এ কেমন প্রথা
সমুচিত দিব সাজা।"

এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য বাহুল্য মাত্র।

স্বাদেশিকতার নামে ভণ্ডামি ও জিহ্বা আস্ফালনের মধ্য দিয়ে যে নীচ আত্মতৃপ্তি একসময়ে একজাতীয় লোক তাকেই পরম কাম্য বলে গ্রহণ করেছিল। কর্মহীন অসাড়তার মধ্যে ঘরের কোণে বসে হাস্যকর বাগাড়ম্বরের সাহায্যে 'মৃত যুগের মন্ত্র' জপ করাই এ যুগের রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্বপুরুষের অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করে বর্তমান হীনতাকে অস্বীকার করবার এই যে নিশ্চেষ্ট মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাকে নিয়ত আঘাত করেছেন।

'বঙ্গবীর'[১] কবিতায় এই শ্রেণীর অসার ভাষাসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির একটা চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে।

"কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর—
সাক্ষী বেদব্যাস।

১। মানসী

আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সযতনে মিলে বারো তেরো জন,
শুধু তরজন আর গরজন,
এই করো অভ্যাস।"

তাছাড়া,

"মোক্ষমূলার বলেছে' 'আর্য',
সেই সব শুনে ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য,—
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

এবং,

'আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে,
লাইব্রেরী-হতে হিষ্ট্রি আনিয়ে,
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে,
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা

এবং পরিণামে,

"ঝি কোথায় গেলি নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এসো, এসো ননীবাবু।
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু,
কালকের দিব শোধ।"

অন্যত্র একটি কবিতায় আছে,

"দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি
এসো তো করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশানে।"

এবং

"চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা অফিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি।
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধে বেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি[১]।"

বাকস্বর্ব্বস্ব জাতির পক্ষের নিছক সাময়িক গরম বক্তৃতা এবং আবেদন নিবেদনের পালাকে আশ্রয় করে নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করা ছাড়া আর কিই বা করবার আছে!

পূর্বোল্লিত 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতাটিরও স্থানে স্থানে এই অন্তঃসার-শূন্যতার চিত্র অন্যদিক দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অশনে বসনে ইংরেজের হীন অনুকরণ করে সেই ইংরেজঘেষা বিকৃত চিত্তবৃত্তি নিয়ে স্বদেশসেবা করতে যাওয়ার মধ্যে যে মর্মান্তিক ব্যর্থতা, নিপুণ ব্যঙ্গ ইংগিতের ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

"লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি
বাঙালি মুখের ছন্দ,—
ধরণে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ।

[১]। দেশের উন্নতি— মানসী

এদের পরিচয়,

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য ;
কোটপরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য।"

পরাধীনতার চরম অবস্থায় সাহেব মাত্রকেই সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাবার যে মজ্জাগত দাসত্ব প্রবৃত্তি তাকেও তিনি আঘাত করতে ভোলেন নি।

প্রশ্ন হচ্ছে—

"ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎ ব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ?"

উত্তর হচ্ছে—

"গেল যে সাহেব ভারি দুই জেব
করিয়া উদরপূর্তি ;—
এঁরা বড়লোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি।"

বঙ্গভূমির দুঃখ ঘোচাবার প্রেরণায় এই জাতীয় ইংরেজঘেষা সুসন্তানেরাই 'মহতী সভা'র ব্যবস্থা করে থাকেন! কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকেরই এ সভায় কোনো স্থান নেই।

কারণ—

"না, না, এ'রা হন জন-সাধারণ
জানে দেশভাষা মাত্র,
স্বদেশ সভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র।"

এর চেয়ে অর্থহীন আত্মঘাতী তামাসা আর কি হতে পারে। সাধারণ দেশবাসীকে অগ্রাহ্য ও অপাংক্তেয় করে মাত্র কয়েকজন ইংরেজিনবীশ সমস্ত কার্যের অবসরে ধীরে সুস্থে, সময় ও সুযোগ মত এই জাতীয় 'স্বদেশ সভার' যে ব্যবস্থা করে থাকেন, স্বদেশসেবার নামে তা একটা নিছক আত্মবিলাস মাত্র। এর ভিতরকার নিলর্জ্জ অসারতার পক্ষে এই জাতীয় তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতই প্রয়োজন।

পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে এই ভাবে অশনে বসনে ইংরেজদের অনুকরণ করতে যাওয়ার মধ্যে আত্মমর্যাদাহীনতার যে নির্লজ্জ পরিচয় আছে চৈতালীর 'পরবেশ' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন।

"ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।"

তবে এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই জাতীয় ব্যঙ্গ কবিতাগুলির মধ্যে লেখকের অন্তরের নিরুদ্ধ জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু এই জ্বালাময় বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে অন্তঃশীলা স্রোতের মত একটা অশ্রুসজল বেদনাক্ষুব্ধ মনের পরিচয় আছে। এ কবিতাগুলি তাই নিছক ব্যঙ্গমাত্র নয়। ভণ্ডামিকে ও অসংগতিকে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌বুদ্ধি ও আত্মমর্যাদাবোধকে উদ্‌বুদ্ধ করবার চেষ্টাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। লেখক নিজেই একস্থানে বলেছেন,—

"দূর হোক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভাণ",

কারণ তার উদ্দেশ্য

"আমার এই হৃদয় তলে
শরম তাপ সতত জ্বলে,
তাইতো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজদান[১]।"

কবির স্পর্শকাতর মন দেশের দুর্দশা ও তথাকথিত দেশ-ভক্তদের চরম ভণ্ডামি দেখে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল! তার এই ব্যথাকেই তিনি সবার মনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। ব্যঙ্গকবিতারূপে এ দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধের কাছে কবির আবেদন। এখানে তাই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও অশ্রুসজল বেদনাবোধের চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সভাসমিতি এবং বক্তৃতাদিতে এক সময়ে যে ভিক্ষাসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং যে নিছক বাগাড়ম্বরকেই আমরা কার্য্য সিদ্ধির উপায় বলে ধরে নিয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা গদ্য প্রবন্ধাদিতেও তাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করেছেন। ১২৮৯-৯০ সালের মধ্যে ভারতীতে প্রকাশিত চেঁচিয়ে বলা,[২] জিহ্বা-আস্ফালন[৩], টৌনহলের তামাসা[৪], অকালকুষ্মাণ্ড[৫] প্রভৃতি রচনাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'চেঁচিয়ে বলা'তে তিনি লিখছেন—" এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নিগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতক গুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই

---

[১] দেশের উন্নতি—মানসী।

[২] চৈত্র, ১২৮৯। [৩] শ্রাবণ, ১২৯০।

[৪] পৌষ, ১২৯০। [৫] চৈত্র, ১২৯০।

উড়িতেছে।”…‘টৌনহলের তামাশা’তে আছে—“সেদিন টাউনহলে একটা মস্ত তামাসা হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগ্‌ডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বডলোক বড় বড় পাগ্‌ড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।” লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই জাতীয় ব্যঞ্জনাবিহীন ব্যঙ্গ শ্রেণীগত উচ্চতার দাবী করতে পারেনা। এগুলি লেখকের উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

নিছক রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে নানাস্থানে তীব্র ব্যঙ্গ ইঙ্গিতে বক্তব্য সরল ও জোরালো হয়ে উঠেছে। ‘ইংরেজ ও ভারতবাসী’[১] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—“আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলা। কেবলই পাখার বাতাস এবং বরফ জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না।…হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো, খস্‌খসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিন্দুকটা খোলো, তোমার গহনাগুলি বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার ও পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ীর নিন্দা করিবে।…..কাজ নাই বকাবকি করিয়া যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।”

---

১ রাজা প্রজা।

'আলট্রা-কনসার্ভেটিভ'[১] রচনাটি আগা-গোড়াই ব্যঙ্গরসাশ্রিত। "যে বাঙালি পায়োনিয়রে পত্র লিখিয়া কেবল 'আলট্রা-কনসার্ভেটিভ' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেমন করিয়া জানিব তিনি কে?

"জানিতে কৌতূহল হইতে পারে কারণ তিনি যে-সে লোক নহেন সবিনয়ে এমন তরো আভাস দিয়াছেন। তিনি না উকিল, না মোক্তার, না স্কুলমাষ্টার। অহো, তিনি এত মস্ত লোক। তাহাকে নিজের চেষ্টায় বড়ো হইতে হয় নাই; নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক, এবং হয়তো অসম্ভব; যে ইংরেজি চিঠিখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে সেও হয়তো বা তাঁহার নিজের রচনা নহে, হয়তো তাঁহার সেক্রেটারি লিখিয়া দিয়াছে।"

এই জাতীয় রচনাগুলিও রসবিচারে নিম্ন পর্যায়েই পড়ে। আঘাতের তীব্রতা ও আতিশয্য এখানে রসবোধের সুষ্ঠু পরিমিতিকে অতিক্রম করে রচনাকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

'লিপিকা'-র কয়েকটি রচনার মধ্যেও রূপক কাহিনীর অন্তরালে বিচিত্র ব্যঙ্গরসের অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে যে ব্যঙ্গ অনেকটা স্থূল ভাবেই নানা কাহিনী কাব্য ও প্রবন্ধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এখানে তাই আরও সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থার নামে কৃত্রিমতার যে অস্বাভাবিক অত্যাচার আমাদের দেশে চলেছে পূর্ববর্তী কোনো কোনো রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যঙ্গের মৃদু কশাঘাত করেছেন এবং তার নিদর্শনও দেখিয়েছি। লিপিকার 'তোতা কাহিনী'তে এসে এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি

---

[১] রাজা প্রজা—পরিশিষ্ট (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০শ খণ্ড পৃ ৫৮)।

আরও সুন্দর ভাবে এবং গভীরতর ভাবব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষার আনুষ্ঠানিক কায়দাকানুন দিন দিন প্রকৃত শিক্ষাকে ছাপিয়ে নিজেই মুখ্যস্থান অধিকার করছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির ছদ্মবেশের অন্তরালে আমাদের অধীনতাপাশকে দৃঢ় করে তোলবার একটা প্রচেষ্টাও সর্বদা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তোতাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে—"খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশিরাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখীর মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই,—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা,—এত শিক্ষার ফলেও কিন্তু অকৃতজ্ঞ পাখী 'সকাল বেলার আলোর দিকে চায়' আর অন্যায়রকমে পাখা ঝট্‌পট্ ক'রে। ফলে, "লোহার শিকল তৈরি হইল পাখীর ডানাও গেল কাটা',—এবং "পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।"

এই ভাবেই কৃত্রিমতার নানা বিধ ব্যবস্থার ফলে পরাধীন জাতিকে একেবারে ব্যক্তিসত্বাহীন জড় পুত্তলিকা করে তোলাকেই শাসকগণ শিক্ষা নাম দিয়ে থাকেন এবং শিক্ষার ছদ্মবেশে মানুষের স্বাভাবিক প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে ধ্বংস করবার এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদও শাসকসম্প্রদায়ের মতে 'বেয়াদবি' বলে বিবেচিত হয়। এই প্রাণহীন বিধিব্যবস্থার বাইরের আনুষ্ঠানিক ভড়ংএর কিন্তু ত্রুটি থাকে না! কমিটি, কমিশন ও পরিদর্শকের ভিড় দিন দিন বেড়ে যায় কিন্তু পরিণামে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। "পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখিকে টিপিলেন। সে হা করিল না, হু

করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুথির শুকনো পাতা খস্ খস্ গজ গজ করিতে লাগিল।”

‘ঘোড়া’ প্রবন্ধটি পূর্বোল্লিখিত ‘ডেঞ্চে পিপড়ে মন্তব্যে’র মধ্যে যে ভাব ইঙ্গিতেব প্রকাশ পেয়েছে, তারই সূক্ষ্মতর এবং মার্জিত রূপ। মানুষ ঘোড়াকে উন্মুক্ত মাঠের অবারিত মুক্তির মাঝখান থেকে ধরে এনে আস্তাবলের ক্ষুদ্র প্রাচীরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। কারণ তাদের মতে “এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়!” তাই ‘ওর হিতের জন্যই’ অনেক খরচে বানানো হয়েছে ‘খাসা আস্তাবল।’

আস্তাবলটি খাসা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই খাসা আস্তাবলের বন্দীত্বের মধ্যে থেকে বন্দী জীবনের তিলে তিলে যে অপব্যয়, শাসক সম্প্রদায় তাকে বুঝেও বুঝতে চায় না। মুখ বন্ধ করবার যতরকম পদ্ধতি তাদের জানা আছে, সব রকমে তারা হতভাগ্য বন্দীর প্রতিবাদের ভাষাকে রুদ্ধ করে দিয়ে এই কথাটাই সর্বদা প্রমাণ করতে চায় যে পরাধীন দুর্বল জাতির পক্ষে বন্দীত্বই একমাত্র কাম্য। স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ততাই এদের নেই। তাই তো দয়া পরবশ হয়েই শাসকেরা এদের অতিযত্নে বন্দী করে রাখেন পরাধীনতার গণ্ডি দিয়ে।

অতীত সংস্কারকে আমরা কিছুতেই এড়াতে পারি না। আমাদের সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান, সমস্ত চিন্তাধারা সমস্ত অগ্রগতি, সব কিছুরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের পূর্বার্জিত এই সমস্ত দৃঢ়মূল শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক সংস্কারের বোঝা। এদের পিছনে একদিন হয়তো কোনো সাধু উদ্দেশ্য ছিল, আজ তা আর নেই। শুধু সেই মৃত উদ্দেশ্যগুলির প্রেতাত্মা-হিসাবেই এই সংস্কারগুলি নিতান্ত অর্থহীন ভাবেই আমাদের ঘাড়ে চেপে পদে পদে আমাদের বাধা দিচ্ছে। ‘দেশশুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে।…এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোটায়

বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যাও করে না, ম্যাও করেনা, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে—এই যে অনড় নিশ্চেষ্টতা, দেশের শাস্ত্রবিৎ তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন—"এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা"। এই অর্থহীন অদৃষ্টবাদই আমাদের বেহুঁস করে আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে। শিরোমণি চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলছেন, "বেহুঁস যারা তারাই পবিত্র, হুঁসিয়ার যারা তারাই অশুচি"—শুনে আমরা একটা মিথ্যা আত্মতৃপ্তি পাই বটে কিন্তু পরিণামে দেশের ভিতরকার এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বুলবুলি যেমন আমাদের কষ্টার্জিত সমস্ত কাজের ফসলে অযথা ভাগ বসায়, তেমনি অন্যদিকে বাইরের দুনিয়ার বর্গীদের হাতেও আমাদের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকেনা। আমাদের ভূতগ্রস্ততার সুযোগে তারা দাবী করে খাজনা আর এই খাজনাই আমরা দিয়ে চলি—"আমাদের আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে"—অতীতের 'কর্তার ভূত'[১] এমনি করেই আমাদের সর্বনাশ করেছে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এর অনেক আগে রচিত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ একই ভাবকে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে যে কথা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সামান্য ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ খুব Seriously এবং বহুল যুক্তিতর্ক সহকারে বলা হয়েছে এখানে সেই কথাই শুধু ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। সেখানে তিনি বলছেন, "অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই

---

[১] লিপিকা

বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না·····।" অন্যত্র তিনি বলছেন—"আমরা দুইহাত উল্টাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা, মনসা, ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই"। এই 'কর্তার ইচ্ছা'ই পরিণামে কর্তার ভূত হয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপে।

গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' এবং এরই নাট্যরূপ 'তাসের দেশে'র মধ্যেও এই ধরণের স্বাতন্ত্র্যবিহীন মানসিক অসাড়তাকে রূপকের অন্তরালে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। আষাঢ়ে গল্পের তাসের দেশের মানুষেরাও ভূতগ্রস্তের মতো চলে। সেখানেও "একটু নড়লেই ওরা দোষ ধরে, বলে অশুচি।" সেখানকার সনাতন শাস্ত্র এই শিক্ষা দেয়—

> ১ "শান্ত যেই জন
> যম তারে ঠেলে ঠেলে
> নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে ;
> বলে, 'মোর নাহি প্রয়োজন।

এও সেই 'অদৃষ্টের চালে চলা', নির্জীব উচ্ছ্বাসহীন জীবনের তিলে তিলে অপমৃত্যু।

(ঘ) পরিণত বয়সে আর একজাতীয় ব্যঙ্গরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নতুন সৃষ্টির সূচনা করেছে। আঘাতের সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতায় এই জাতীয় ব্যঙ্গ অপূর্ব। 'শেষের কবিতা'য় নরেন মিত্তিরের দেহ ও স্বভাবের যে বর্ণনা তাকে একহিসাবে ব্যঙ্গরচনার চরমতম মার্জিত রূপ বলা যেতে পারে। নরেন মিটার নিজেকে আর্টিষ্ট বলে পরিচয় দেয়, কারণ "নিজেকে আর্টিষ্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়।" কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে "কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল।" এবং তাই "এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে।" তারপর তার চেহারার বর্ণনা,—'চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরও ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেই বাহুল্য হোত।' ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই করা চলেনা, কারণ—'দামি হাভানা দুচার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা এবং মাঝে মাঝে গাত্রবস্ত্র পার্সেলপোষ্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো' ইত্যাদি অভিজাতসুলভ সমস্ত বিধিকেই সে পুরোমাত্রায় মেনে চলে। তাছাড়া "ওর স্লাঙ্‌ বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত;......এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।'

এ হেন ভ্রাতার উপযুক্ত সহোদরা কেটি মিটারের বর্ণনাও বিশেষ উপভোগ্য। কেটি মিটারের "চালচলন ওর দাদারই কায়দা কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা, বিলিতি কৌলীণ্যের ঝাঁঝালো এসেন্স।' ওর বর্ণনায়—"সবচেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।"

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী যেন তীক্ষ্ণ শলাকার রূপ ধারণ করেছে। অতি আধুনিকতার নামে যে যথেচ্ছাচার নানা ক্ষেত্রে চলে থাকে, তার বীভৎসতা ও অসারতা এর মধ্যে যথার্থ রূপ গ্রহণ করেছে। এখানে যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি হয়েছে তা emotion কে বাদ দিয়ে intellect এর দিকেই ঝুকেছে বেশী। ক্ষুরধার বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতির কাছেই এর আবেদনের যথার্থ সার্থকতা। তিন সঙ্গীর অন্তর্গত 'রবিবার' গল্পটিতেও স্থানে স্থানে এই জাতীয় ব্যঙ্গবর্ণনার আভাস আছে।

লক্ষ্য করা দরকার যে,—যদিও কোনো কোনো সমালোচক এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তবুও আমার মতে,—রবীন্দ্রনাথ এখানে স্থানে স্থানে নির্মম হলেও কোথাও হৃদয়হীনতার পরিচয় দেননি। তাই হাল পাশ্চাত্যিকতার finished product, চরমতম অবদান কেটি মিটার, যে সর্বদাই, বিপক্ষদলকে 'that much for it' বলে তুড়ি মেরে চলতে অভ্যস্ত, 'রূঢ়তাকে যে অকপটতা বলে বড়াই করে',—তার এনামেল করা মুখেও তিনি চোখের জলের ধারা

বইয়েছেন। মুখটা এনামেল করা হলেও ভিতরে ভিতরে যে চিরন্তন অশ্রু উৎসের আভাস ছিল তার সত্যতাও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যায়নি।

'বাঁশরি' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ wit এর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছেন। এই নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের ভিতর দিয়ে wit-এর উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিংগ ঠিকরে পড়ে। মার্জিত বুদ্ধির প্রকাশে, সমুজ্জ্বল ভাষার পারস্পরিক সংঘাতে নাটকীয় রস ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ক্ষিতীশের চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতি আধুনিক উদগ্র বাস্তবপন্থী সাহিত্যিকদের প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করা হয়েছে বলা যায়। কিন্তু এই কটাক্ষ ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা থেকেও বড় করে দেখা দিয়েছে নিষ্কলুষ wit-এর প্রখর দীপ্তি। সমস্ত রচনাটিই যেন শাণিত তরবারির মতো বুদ্ধি-বৃত্তির আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছে।

পূর্বেই বলেছি যে যৌবনের প্রারম্ভে কিছু কিছু অসিষ্ণুতার পরিচয় দিলেও রবীন্দ্রনাথের মার্জিত রুচি রসবোধের আভিজাত্য তাকে ব্যঙ্গরসের মূল প্রাণস্পন্দনটি ধরতে সাহায্য করেছিল। ব্যঙ্গরচয়িতার লক্ষ্য আঘাত দেওয়া নয়, তার যথার্থ উদ্দেশ্য মানুষের প্রচ্ছন্ন আত্ম-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। অসংগতি ও অযৌক্তিকতা যেখানে আমাদের মানসিক বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নানা অর্থহীন আবর্জনার সৃষ্টি করে, ব্যঙ্গের আঘাতে সেই অসংগতি ও অযৌক্তিতাকে স্পষ্ট করে তুলে তার অন্তর্নিহিত মূঢ়তাকে প্রকাশ করাই তার কাজ। এই কারণে গভীর অনুভূতিই প্রকৃষ্ট ব্যঙ্গরসিকের রসউৎসের প্রাণস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরসাশ্রিত রচনাগুলিও কবিচিত্তের এই গভীর অনুভূতির পরিচয় স্পর্শে স্বার্থক রসপর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের আর

একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। 'দামু ও চামু' এবং 'বাশরি' বা 'শেষের কবিতা' একই রচয়িতার রচনা হলেও ভাবের প্রাচুর্য অনুভূতির প্রাখর্য এবং ব্যঙ্গইঙ্গিতের ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এদের মধ্যে কোনো তুলনাই হয় না। দেখা যাচ্ছে যে বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ রচনাগুলি শুধু যে মার্জিত হয়ে উঠেছে তা নয়, এগুলির অন্তর্নিহিত আঘাত আরও তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করেছে এবং পরিণামে অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে বুদ্ধিদীপ্ত wit-এর পরিচ্ছন্নতার দিকেই তিনি বেশী ঝুকেছেন।

(৩)

(ক) কোনো সমালোচক বলেছেন—'The art of the humourist is a creative art'।[১] অসংগতি ও অযৌক্তিকতা জগতের নানা ক্ষেত্রে মানুষের নানা কাজে ও ভাবভংগীর মধ্য দিয়ে 'বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়'। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এর রসমাধুর্য ঠিক মতো উপলব্ধি করা যায় না! এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন হাস্যকর ব্যাপারকে—'নিবিড় করে সাজিয়ে গড়ে তোলাতেই শিল্পীর বাহাদুরি' —এবং এই সমগ্র রূপসৃষ্টির মধ্যেই হাস্যরসের যথার্থ অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। রূপসৃষ্টির এই যে সমগ্রতা এর মধ্যেই হাস্যরসিকের যথার্থ নৈপুণ্য।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে বাস্তবজীবনে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু অসংগতি বা অযৌক্তিকতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু

---

১ P. Choudhury—Rabindraath's wit & humour ( V. B. Qrly. )

তাই বলে সেইগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কারণ সেখানে হাস্যরসের উপাদানের গভীরতা এত কম হয়ে পড়বে যে তার উপর নির্ভর করে সার্থক রসসৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে একস্থানে যে চমৎকার আলোচনা করেছেন তা উদ্ধৃত করলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবে। তিনি বলেছেন—"অসংগতি ও অযৌক্তিকতা যেখানে মানব চরিত্রের একটা ব্যাপক পরিচয় দেয় সেখানেই সে হাস্যরসের বড় রকমের উপাদান যোগায় আর যেখানে সে অগভীর, যেখানে সে মানব চরিত্রের একটা অবান্তর বিষয় মাত্র, সেখানে সেটাতে কেবল ভাড়ামি প্রকাশ করা যায়"। এর উদাহরণ স্বরূপ তিনি আরও বলেছেন—"কোন পাত্রের তোৎলামিতে লোকে হেসে অস্থির হতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ সাহিত্য রসনৈপুণ্যের যশোলাভ করা যায় না। প্রতি পাত্রের প্রকৃতিতে এমন একটা হাসি বা কান্নার দিক আছে যাকে স্থায়ী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সে ম্লান হয় না।"

রসের এই স্থায়ী প্রকাশই সাহিত্য সৃষ্টির মূলকথা। খণ্ড বিচ্ছিন্ন অগভীর উপাদানকে বসসৃষ্টির সমগ্রতার সাহায্যে স্থায়ী করে তোলাতেই স্রষ্টার কৃতিত্ব। (রস বিচার করতে গেলে) "দেখা দরকার যে যা আকস্মিক, যা উপরে উপরে ভাসছে তাকে অবলম্বন করা হয়েছে না স্বভাবের গভীরতর লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করা হয়েছে"—রসবিচারের এই যে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন তার সত্যতা তাঁর নিজের রচনা থেকেই সব চেয়ে সার্থকভাবে প্রমাণিত হবে।

(খ) মূলতঃ হাস্যরসাশ্রিত রচনাগুলিকে এবং অন্যান্য নানা নাটক উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কৌতুকাবহ চরিত্রের অবতারণা

করেছেন। তার স্বাভাবিক প্রতিভাষণে তিনি এই চরিত্রগুলির ব্যাপক রূপকেই আমাদের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন। 'স্বভাবের গভীরতর লক্ষণের প্রকাশে' এগুলি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'গোরা'র কৈলাস চরিত্রটিকেই ধরা যাক। মূল উপন্যাসের বিরাট পটভূমিকায় এ চরিত্রটির স্থান খুবই গৌণ এবং গ্রন্থবিচারে এর সার্থকতাও খুব কম। কিন্তু লেখকের তীক্ষ্ণ রসোজ্জ্বল প্রতিভা গৌণতার অপরাধে এই চরিত্রটিকে খর্ব হতে দেয়নি। সামান্য পরিসরের মধ্যে অল্পকথায় সমগ্র মানুষটির একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ধরা পড়েছে। চারিদিকের বড় বড় চরিত্রের ভীড়ের মধ্যে পড়েও তার স্বতন্ত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্য সে আমাদের জানিয়ে দেয়। "গায়ে তসরের চায়না কোট্, কোমরে চাদর জড়ানো, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ"—এই বেটে আঁটসাঁট মজবুত গোছের চেহারাওয়ালা মানুষটি যখন সুচরিতাকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে কন্যার বাড়ী ঘর দুয়ারের মূল্য যাচাই করতে বসে এবং গভীরভাবে মন্তব্য করে—'বাড়ীটা বুঝি তারই, পাকা বাড়ি দেখছি'—এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শুভংকরীর সাহায্যে তার একটা দামও ঠিক করে ফেলে এবং কিছু পরেই স্বকপোলকল্পিত অধিকার সাব্যস্তের ভূমিকাস্বরূপ হরিমোহিনীকে সাবধান করে দেয়—"না না সে হচ্ছেনা, বউ ঠাকরুণ, এ ঘরে তোমার জল ঢালাঢালি চলবে না"—তখন তার দেহের পরিচয়ের সংগে সংগে তার মনের পরিচয়টাও আমাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং সমগ্র চরিত্রটির কৌতুকাবহ ভাবভঙ্গীতে নিরুদ্ধ হাস্যের বেগে পাঠক চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিবাহ-উৎসুক এই পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের ভবিষ্যৎ আশাভঙ্গের কথা স্মরণ করে আমরা একটু হাস্যমিশ্রিত করুণাবোধ না করেও পারিনা।

'নৌকাডুবি'র ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এই জাতীয় আর একটি চরিত্র।

"ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা", ইনি "তেমনি সমস্ত পশ্চিম মুলুকের চক্রবর্তী খুড়ো"। এর সবচেয়ে বড গুণ চমৎকার অম্বল রাঁধবার পারদর্শিতা। নিজের এই বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধে তিনি অবশ্য খুবই সচেতন। তিনি বলছেন,—'আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল, তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হস্ত পাকিয়া গেছে। আমি অম্বল যা রাঁধিব তা আজকের মতো খাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চারদিন লাগিবে। তারপর একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে চক্রবর্তী খুড়ো দেমাক করে বটে, কিন্তু অম্বলও রাঁধে।" পরিণামে কিন্তু এই চক্রবর্তী খুড়োর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে বিস্মিত হতে হয়। চক্রবর্তী খুড়ো মূলতঃ রসিক ব্যক্তি, তিনি নিজে হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান নয়।

এখানেই একটা কথা বলার প্রয়োজন। হাস্যরসপ্রধান রচনার যে রস, তা দুভাবে আমাদের নিকট উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। প্রথমতঃ হাস্যকর চরিত্রের অবতারণা করে তাদের কথাবার্তা ভাব-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে তাদের নিজ নিজ চরিত্রগত অসংগতি ও অযৌক্তিকতার একটা সমগ্র রূপকে প্রকাশ করে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিমান রসিক চরিত্রগুলির পারস্পরিক কথোপ-কথনের মধ্য দিয়েও এই রসের উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। কৈলাস চরিত্রটি নিজেই এই রসের জোগান দিয়েছে, তার নিজের চরিত্রের মধ্যেই অপরের হাস্যোদ্রেক করবার উপাদান রয়েছে। অন্যপক্ষে চক্রবর্তী খুড়ো কথাবার্তার সরসতা ও সহজ রসিকতার সাহায্যে এই রসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার নিজ চরিত্রগত কোনো অসংগতিই এখানে রসের উপাদান নয়। 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয় ও চন্দ্রবাবুর তুলনা করলেই এই বিভিন্নতা আরও সুস্পষ্ট হবে।

চন্দ্রবাবু আত্মভোলা খেয়ালী লোক। জগতে এই জাতীয় লোকের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনো উপায় নেই, তারা নিজেরা নিজেদের চালিয়ে নিয়ে যেতেও অক্ষম। শিশুর পক্ষে এই জাতীয় পরনির্ভরতা ও খেয়ালীপনা শোভা পায় কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই জাতীয় ব্যবহার নিতান্তই অসংগত ও অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। চারিদিকের সুসংবদ্ধ জীবনপ্রণালীর মধ্যে এই জাতীয় চরিত্রগুলি যেন খাপছাড়া ভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এই অসংগতিকে বিরক্তির হাসি দিয়ে অবজ্ঞা করে থাকেন, কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তির কাছে এই অসংগতির অন্তরালে যে সারল্য, যে অসহায়তা তাকে সমবেদনা দিয়ে অনুভব করবার প্রয়োজন ঘটে। এইভাবে যে humour এর সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা প্রকৃষ্ট humour বলতে পারি। "The best humour is that which is flavoured throughout with kindness and tenderness:"

কৈলাস চরিত্রের মধ্যে যে humour-এর আভাস মাত্র পাওয়া যায় চন্দ্রবাবুর চরিত্রে তারই চরম বিকাশ ঘটেছে। এই জাতীয় humour-এর ঠিক পরবর্তী স্তরেই আমরা অশ্রুজলের সূচনা পাই। "অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখবোধ হয়।......স্থূলকথাটা এই যে অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"[১] নিছক হাসি ও করুণার অশ্রু উৎস—এই দুই সীমারেখার মধ্যবর্তী স্তরেই খাঁটি হাস্যরসের স্থান।

---

১ পঞ্চভূত—কৌতুকহাস্যের মাত্রা

চন্দ্রবাবু চিরকুমার। তিনি চিরকুমার সভার ঘরে বসে বড় আদর্শের স্বপ্ন দেখেন, এই আদর্শকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাসও করেন। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য মোচনের আশু উপায় বাণিজ্য, চিরকুমার সভার সভ্যদের সাহায্যে এই বাণিজ্যের প্রসারই তার আদর্শের মূলকথা। কিন্তু আদর্শের স্বপ্নেই তিনি বিভোর, তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় নেই, theory ও practice যে এক নয় এ জ্ঞান তার কাছে অবান্তর। সভার অধিবেশনের সময় যে বৃদ্ধশিশু "ফেণী, আমার গলার বোতাম কোথায়" বলে চিন্তিত প্রশ্ন করেন এবং পরে বোতামটিকে গলাতেই বিরাজমান দেখে সলজ্জ হাস্যে চুপ করে থাকেন তার কাছ থেকে আমরা আর বেশী কি আশা করতে পারি। মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ অথচ ব্যবহারিক জীবনে শিশুর মত সরল ও অসহায় এই চরিত্রটি রসসাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। চিরকুমার সভা যেমন তার এই সৌম্য শান্ত সভাপতিটির উপর নির্ভর করেই প্রধানতঃ বেঁচে ছিল, তেমনি সমগ্র গ্রন্থের রসোৎকর্ষও অনেকটা এই চরিত্রটির উপর আশ্রয় করেই স্ফূর্তি পেয়েছে।

অক্ষয় চরিত্রটি বুদ্ধিসঞ্জাত মার্জিত রসগর্ভ কথোপকথনের যে art বা শিল্পচাতুর্য তারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ। একদিকে শৈলবালা, নীরবালা, নীপবালা ইত্যাদি, অন্যদিকে অক্ষয় এদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধের যে খণ্ড অভিনয় সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে—তাতে করে এক-জাতীয় humour-এর সৃষ্টি হয়েছে। একে অবশ্য পূর্বসংজ্ঞা অনুযায়ী humour না বলে wit বলাই অধিকতর সংগত। অবশ্য বাঁশরির মধ্যে পারস্পরিক বাক সংঘাতে যে রসস্ফুলিংগের সৃষ্টি হয়েছে তাতে হৃদয়ের স্থান নিতান্তই গৌণ, সে একেবারে নিছক বুদ্ধির তরবারি যুদ্ধ, বাক্যের ঘাত প্রতিঘাত। কিন্তু এখানে আমরা যে wit-এর পরিচয়

পাই তাতে বুদ্ধির ঝলকানি থাকলেও এরমধ্যে হৃদয়ের আবেদনও অনেকখানি। এ শুধু আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দিয়েই নিবৃত্ত হয় না, আমাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করে যায়।

অক্ষয় নিজেই রসিক। চন্দ্রবাবুর মত তার নিজের চরিত্রে অসংগতিজাত রসোপকরণের চিহ্নমাত্র নেই। অপরকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করেই সে রস উৎসের অন্তঃশীলা ধারাকে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। ইংরেজীতে যাকে repartee বলা হয়, অক্ষয় তাতে খুবই অভ্যস্ত, ঝোকের মাথায় দুচার লাইন গান বা কবিতা মুখে মুখে রচনা করবার ক্ষমতাও তার আছে। সহজাত এই অস্ত্র নিয়ে লোকের দুর্বলতার সুযোগে তাদের নাকাল করাতেই তার বিশেষ কৃতিত্ব। দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়ের চারিত্রিক দুর্বলতা তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি এবং এই দুর্বলতার ছিদ্রপথে সে এই দুটি অল্পবুদ্ধি লোককে নিয়ে হাসির ঝড উঠিয়েছে। দারুকেশ্বর এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই বুদ্ধিহীন, দারুকেশ্বর আবার নিজেকে একটু বেশী চালাক বলে মনে করে, তাই অক্ষয়ের রঙ্গজালে সেই জড়িয়ে পড়েছিল সবচেয়ে বেশী। অক্ষয়ের প্ররোচনায় অতিবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে সর্বতোভাবে আধুনিক এবং অক্ষয়ের প্রার্থিত আদর্শের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করবার জন্য তার যে আপ্রাণ চেষ্টা তাতেই আমাদের কৌতুক-হাস্য উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। অক্ষয়ের অন্তরটিপুনিতে নিতান্ত উৎসাহ সহকারে সে যখন গান ধরে—

> "অভয় দাও তো বলি আমার wish কি
> একটি ছটাক সোডার জলে পাঁকি তিনপো হুইস্কি।"

এবং

> "কতকাল রবে বল ভারতরে
> শুধু ডাল-ভাত-জল পথ্য করে।

দেশে অন্নজলের হোল ঘোর অনটন
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া।"

তখন অক্ষয়ের পক্ষে নিরীহ ভালোমানুষের মত গম্ভীর হয়ে থাকা সম্ভব হলেও আমরা না হেসে পারি না।

এখানে আর একটি বিষয় কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। এই দুটি চরিত্রের অবতারণার মধ্যে যে রঙ্গরস তার প্রকৃত মূল কিন্তু চরিত্র দুটির মধ্যেই নয়। কেবলমাত্র চারিত্রিক রস বিচারে এদের স্থান হাস্য-রসের নিম্ন পর্যায়েই পড়বে। কিন্তু অক্ষয়ের উস্কানিতে এই দুটি বিবাহ-উৎসুক প্রাণীর হাস্যকর উন্মত্ততার যে পরিচয় আমরা পাই এবং বিশেষ করে অক্ষয়ের হাতে খেলার পুতুলের মত এদের যে মর্মান্তিক নাকানি চোবানি, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যেই প্রকৃষ্ট হাস্যরসের উপাদান নিহিত রয়েছে। এদের চরিত্রের মধ্যে বাইরের সাত্ত্বিকতার আবরণের অন্তরালে যে ভণ্ডামী আছে শুধু মাত্র তাকে আশ্রয় করে রসসৃষ্টি করতে গেলে তাতে স্বভাবতই satire বা ব্যঙ্গরসই প্রাধান্য পেত—অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব হোত না। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে চরিত্র দুটির আভ্যন্তরীণ এই অসারতার চেয়ে অক্ষয়ের সুনিপুণ পরিচালনায় তারা যেভাবে নিজেদের মানসিক অন্তঃসারশূন্যতাকে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বাইরে প্রকাশ করে ফেলেছে—সেইটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাতে করেই নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এখানে অক্ষয় চরিত্রটিকে এক হিসাবে লেখকেরই প্রতিনিধি বলা যায়।

রসিককে এককথায় অক্ষয়ের Prototype বলা যেতে পারে। নাটকীয় প্রয়োজনের খাতিরেই এই চরিত্রটির অবতারণা করা হয়েছে।

পূর্ণ, শ্রীশ ও বিপিন—চিরকুমার সভার এই তিনটি একান্ত নিষ্ঠাবান যুবক সভ্যের মনে তিনটি কুমারী যে ওলোট পালটের সৃষ্টি করেছিল তাকে সামাল দিয়ে তাদের কুমারত্ব খণ্ডনের ঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্যই রসিকের প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য অক্ষয়কে দিয়েও এ কাজ হতে পারত কিন্তু কুমারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড়িত থাকায় অক্ষয়ের পক্ষে এ কাজ একটু বেমানান হোত। সাবধানী লেখক সে বিষয়ে সচেতন, তাই শ্রীশ ও বিপিনের প্রণয় ইতিহাসের একমাত্র সহিষ্ণু শ্রোতারূপে এবং পূর্ণচন্দ্রের প্রেম অভিযানের সমস্ত আটঘাট বাত্‌লে দেবার গাইড্‌ বা নির্দেশক হিসাবে রসিকচন্দ্রকেই অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ প্রহসনের মধ্যে চিরকুমারসভাই রসবিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান পাবার যোগ্য। এখানে হাস্যরসের সঙ্গে নাটকীয় রসের সুন্দর সমন্বয় হওয়ায় এর অন্তর্নিহিত হাস্যরস একটা সুসংবদ্ধ স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পেরেছে।

ঘটনার আকস্মিকতা এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের ভুলব্যাখ্যার ফলে অনেক সময় যে একটা Comedy of Errors এর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে অবলম্বন করেও রসসৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এই জাতীয় রস-রচনার ভিত্তি খুব দৃঢ় বা স্থায়ী নয়। ঘটনার আকস্মিকতাকে খুব বড় করে দেখালেও একে আশ্রয় করে উচ্চশ্রেণীর রসসৃষ্টি সম্ভব নয়,—কারণ এই জাতীয় রচনার মধ্যে চরিত্রগত কোনো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের বিশেষ কোনো সুযোগ ঘটে না, অর্থাৎ হাস্যরসের মূল উপাদানটি এখানে অগ্রাহ্য হয়ে পড়ে। চিরকুমার সভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ তার ভিতরকার চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্থায়ী চিত্রণ। বিশেষভাবে এর উপর নির্ভর করেই রচনাটির রসসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠেছে। ভিত্তির দৃঢ়বদ্ধতাই একে রসোৎকর্ষ দান করেছে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে বৈকুণ্ঠের খাতাকেও আমরা উচ্চ স্থান দিতে পারি। এর ভিতরেও চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ ঘটেছে প্রচুর এবং এই চরিত্রগুলির বিভিন্ন রূপায়নের মধ্য দিয়েই হাস্যরস ফুটে উঠেছে।

বৈকুণ্ঠ চন্দ্রবাবুরই মত আর এক খেয়ালী। এর খেয়াল রূপ নিয়েছে সাহিত্য আলোচনা এবং প্রাচীন সাহিত্যে সংগ্রহের মধ্যে। জাগতিক সুখ সুবিধা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তিনি বুঝতে পারেন না, অপরের ব্যবসাবুদ্ধির ফাঁদে পড়ে বারবার তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু এই ফাঁকিকে বোঝবার সাধ্য তার নেই—কেউ বুঝিয়ে দিলেও না। সুচতুর কেদার প্রাচীন চৈনিক সংগীত গ্রন্থ বলে চীনে মুচির হিসাবের খাতা তাকে গছিয়ে দিয়ে যায়, কোথাকার কে বিপিন বাবু এসে তাকে গৃহচ্যুত করবার যোগাড় করে, কেদারের চক্রান্তে তার সর্বস্ব যায় যায় হয়ে ওঠে—তবু তিনি নির্বিকার, কোনো নালিশই তিনি করেননি কারো কাছে। নিজের যে লেখার বাতিক তার জন্য তার কুণ্ঠার সীমা নেই, চাকর ঈশানের কাছেও তিনি যেন এইজন্য বিশেষ লজ্জিত। কিন্তু তবু লেখা, শোনাবার জন্য তার আগ্রহের অন্ত নেই, কেদার ও তিনকড়ি তার প্রকাণ্ড খাতাকে রীতিমত ভীতির চক্ষে দেখে! তার এই বাতিকের জন্যই তিনি হাস্যরসের উপাদান যুগিয়ে এসেছেন। কিন্তু পরিণামে এই চরিত্রটি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে: বাতিকগ্রস্তের যে নেশা এতদিন সকলের হাসির খোরাক যুগিয়েছে সেই সম্বন্ধের শেষে যখন তাকে ম্লান হাসির সঙ্গে বল্‌তে শুনি,—"আমার লেখা, সে আবার একটা জিনিষ, সবাই হাসে আমি কি তা জানিনে! ঈশ্বর, ওসব রইল পড়ে, সংসারে লেখায় কার কোন দরকার"—তখন আমাদের মনে হয়, ছি ছি এই সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে নিয়ে আমরা এতদিন হাসি-ঠাট্টা করেছি! তারপর বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে এই লেখা

সম্বন্ধে তাকে আবার বলতে শুনি—"ভেবেছিলাম খাতাপত্রগুলো আর সংগে নেবো না, শুনে মা নীরু কাঁদতে লাগলো—ভাবলে বুড়ো বয়সে লেখাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্ছে"—তখন একটা নিরবিচ্ছিন্ন করুণতায় আমাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। সংসারের কুটিলতা এবং স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত এই সরল-প্রাণ, খেয়ালী আপনভোলা বৃদ্ধকে আঘাত করতে ছাড়েনি। তিনি সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু যে ভাইকে তিনি এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছেন সেও যে তাকে ভুলে গেলো, তিনি চলে গেলে অন্য সবাইকার মতো তারও যে কোনো কষ্ট হবে না—এই চিন্তাই তার কাছে অসহ্য। তাই ঈশান যখন অবিনাশকেও বিপক্ষদের পরিপোষক ব'লে প্রমাণ করতে যাচ্ছে তখন 'বৈকুণ্ঠের মর্মস্থল থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ এইভাবে বেরিয়ে পড়েছে—"লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়"—এখানেই করুণরসের চরম প্রকাশ।

অবিনাশের চরিত্রেও যে হাস্যরসের উপাদন আছে তা প্রকাশ পেয়েছে বিয়ের খবর শুনে তার আত্মহারা ভাবের মধ্যে। 'করতল' ও 'পদতল' নিয়ে তার যে মাতামাতি এবং দেবীর সঙ্গে 'প্রণয়োপহার' কথাটা খাটতে পারে কিনা সেজন্য তার যে মহাসমস্যা—যে সমস্যার ধাক্কায় কেদারকে পর্যন্ত মরিয়া করে তুলেছে—তার ভিতর দিয়ে তার যে অশোভন অধীরতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে আমাদের কৌতুকহাস্যেরই উদ্রেক হয়। একদিকে বৈকুণ্ঠের খাতা অন্যদিকে অবিনাশের একটি লাইনের ধাক্কা—এই দুয়ের মধ্যে পড়ে হতভাগ্য কেদারের যে দুরবস্থা সেটা তার পক্ষে খুব দুঃসহ হলেও আমাদের পক্ষে খুবই উপভোগ্য। অতি দুঃখেই কেদার ঈশানকে বলেছে—"তোমার বড়বাবু খুব বিস্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোটবাবু—কি

বলে—অতি সংক্ষেপেই লেখেন, কিন্তু আমার কপালক্রমে দুই-ই সমান হয়ে ওঠে”—বেচারা কেদার !

তিনকড়ি চরিত্রটি এই নাটকখানির একটি বিশেষ সম্পদ। কেদার চরিত্রের যে ভণ্ডামি তাকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলবার জন্য এই চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল। তিনকড়ি কেদারের নিত্য সহচর, কিন্তু তবুও প্রতি কথার ভিতর দিয়ে নানাভাবে সে কেদারের নির্লজ্জ ভণ্ডামিকে আঘাত করে এসেছে। তিনকড়ি নিজেই তাদের এই অপূর্ব জুটির কথাপ্রসঙ্গে বলছে—“উনি যদি হন গরু আমি হই ওর লেজ। যখন চ'রে খান পিঠের মাছি তাডাই আবার যখন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন লেজ-মলাটা আমার উপর দিয়ে যায়।” অত্যন্ত সহজ রসিকতার সঙ্গে বলা হ'লেও এই কথাগুলির মধ্যে একটা করুণ রসের স্পর্শাভাস রয়েছে। একটা সূক্ষ্ম আত্মধিক্কারের ভাবও এতে পাওয়া যায়। এখানেই তিনকড়ি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কেদারের মতো নিছক স্বার্থপর ভণ্ড সে নয়। যদিও সে কেদারের সমস্ত অকাজেরই সঙ্গী তবুও তার মধ্যে একটা ভালোর দিক আছে। মাতৃহীনা নীরুর কথা শুনে সে বলছে—“আহা, মা নেই, ঠিক আমারই মতো”। নিজের সম্বন্ধে সে বলে—“ভাই তিনকড়ির ভাগ্যে বিঘ্নি ঢের আছে বরাবর দেখে আসছি। জন্মাবামাত্রই দুধ খাবার জন্য কান্না ধরলুম—তার ঠিক পূর্বেই মা গেলো মরে।” তারপর হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সে আবার বলছে—“যম বেটা ঠাওরালে এ ছোড়ার দুনিয়ায় কেউ নেই, নেহাৎ তাচ্ছিল্য ক'রে নিলে না।” এই সমস্ত কথার ভিতরে তার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একটা করুণ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তিনকড়ি সোজাসুজিই কেদারকে বলে ফেলেছে—‘বৈকুণ্ঠকে যদি ফাঁকি দিস তাহলে অধর্ম হবে’—এখানেই তিনকড়ি চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ঈশান চরিত্রটিও লেখকের চমৎকার সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। এই গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ ভৃত্যটি মনিবকে বিশেষ গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না, কিন্তু সামান্য ক্ষতিটুকু পর্যন্ত সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটা এখানে অনেকটা আত্মীয়তা বন্ধনে এসে পৌঁছেছে। ঈশান স্বভাবতই গম্ভীর, কিন্তু এই অটল গাম্ভীর্যের অন্তরালে রয়েছে একটা শিশুমন। তাই ঈশান নিজে কখনও হাসে না বটে কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সে অজ্ঞাতসারেই অনেক সময় মৃদুহাস্য সৃষ্টির সহায়তা করেছে।

(গ) শেষরক্ষাতে এসে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রসৃষ্টির দিকে ততটা লক্ষ্য না রেখে ঘটনা সংস্থানের আকস্মিকতার উপরেই জোর দিয়েছেন বেশী। এখানে চরিত্রগুলির মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যার উপর আশ্রয় করে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে পারে। শুধুমাত্র ঘটনাচক্রের মধ্যে পড়ে এরা Comedy of Errors গড়ে তোলবার যন্ত্রমাত্র হয়ে পড়েছে। গদাই ও ইন্দু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা পরস্পরকে ভুল নামে জেনে এসেছে। তাই একদিকে ইন্দু ললিতবাবুর খোঁজে ব্যস্ত, অন্যদিকে গদাইচন্দ্র কলেজে যাবার নাম করে বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কাদম্বিনী চৌধুরীর মোজার বিল চুকিয়ে দিয়ে সেই মোজা বক্ষে চেপে ধরে তাপিত অন্তর শীতল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। পরে পিতার কাছে এই লুকোচুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পর্যন্ত সে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। অনেক গণ্ডগোল হা-হুতাশের পর এই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির পালার যে শেষরক্ষা হোল তারও মূলে রয়েছে অনুকূল ঘটনাসংস্থান, যাতে করে গদাই ও ইন্দুর ভুলসংশোধনের সুযোগ ঘটেছিল।

মূলকাহিনীর অন্তরালে যে আর একটি শাখাকাহিনীর অবতারণা

করা হয়েছে তাতেও চরম পরিণতিকে সফল করে তোলা হয়েছে ঘটনা সাজানোর কুশলতার সাহায্যে। দারিদ্র্যভয়ে ভীত বিনোদ কমলকে বিয়ে করেও দূরে দূরে থাকে, তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। এমনি অবস্থায় নিবারণ এসে খবর দিলেন যে কমল প্রকৃতপক্ষে অনেক সম্পত্তির মালিক এবং তিনি এ আশ্বাসও দেন যে এই খবর শুনলে কবি বিনোদচন্দ্রও দারিদ্র্যভয় ভুলে তার কাছে এসে পড়বেন। পরক্ষণেই দেখতে পাই যে এখবর শোনবামাত্র স্বামীপরিত্যক্তা মৃদুভাষী কমলের মনে মতলব জেগে উঠেছে। সে নিবারণকে বারণ করছে বিনোদকে তার এই অবস্থা পরিবর্তনের কথা জানাতে এবং ইন্দুকে তার এই মতলবের কথাও খুলে বলছে—'আমি একটা বাড়ী নিয়ে ছদ্মবেশে তাঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব'। কমলের এই স্বীকারোক্তি স্বভাবতই প্রথম থেকে আমাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে দমিয়ে দেয়। কি করা হবে, কি ঘটবে তা আগে থেকে জানতে পারলে পাঠকের কৌতূহল আর থাকে না। নাটকীয় রসবিচারে এটি একটি প্রধান ত্রুটি। কাহিনীর শেষভাগে অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তী কমল ও তারই নিযুক্ত কর্মচারী হিসাবে বিনোদের মধ্যে যে কথোপকথন তাতেও হাস্যরসসৃষ্টির কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া ঘটনাসংস্থানের সামান্য হেরফেরের যে দুর্বল ভিত্তি তারই উপর আশ্রয় করে থাকায় এই রস কোথাও ঘনীভূত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি। উদ্ভাবনা ও সংস্থান—উভয়দিক দিয়েই সমস্ত কাহিনীটি একটি কৃত্রিম আড়ষ্টতার ভারে দোষদুষ্ট।

মূল ও শাখাকাহিনীর এই ভিত্তিগত দুর্বলতাকে বাদ দিলে অন্য দিক দিয়ে এর মধ্যে প্রকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্টির প্রচুর উপাদান পাওয়া যায় এবং লেখকও পূর্ণমাত্রায় এগুলির সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সদ্যপ্রেমমুগ্ধ গদাইচন্দ্রের কবিতা রচনার যে মর্মান্তিক প্রয়াস—

**"কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে**
**কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।"**

—তা শুনে তার চিত্তের 'অস্বাস্থ্যকর অবস্থা' সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। "বুদ্ধি পরিস্কার থাকলে কবিতার ব্যাকটিরিয়া জন্মাতেই পারে না—চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই"—এ অভিমত স্বয়ং গদাইচন্দ্রেরই! তারপর প্রেমের দেবতাটির নিষ্ঠুর চক্রান্তে বেচারী গদাই যখন বাগবাজারের পথে পথে হা হুতাশ করে বেড়াচ্ছে, কাদম্বিনী চৌধুরীর ঝিকে ডেকে তার দিদিমণির জন্য ভরু ফুলুরিওয়ালার গরম বেগুনি কিনে দিচ্ছে এবং সাত সাত জোড়া পুরাণো মোজা বুকে চেপে ধরে ভাবগদ্‌গদ মুহূর্তে কবিতা রচনা করে ফেলছে—

**"আমার শূন্য হৃদয়ের মত ওগো শূন্য মোজা**
**অনুপস্থিত কোন দুটি চরণ সদাই করিতেছে খোঁজা**
**বিনা পায়েই প্রাণের ভিতর চলে গিয়েছ সোজা।"**

তখন এর অন্তর্নিহিত কৌতুকরসও আমাদের মনের ভিতর সোজাই চলে যায়। তবু ভালো যে শেষ পর্যন্ত গদাই মোজার সংগে রোজার মিল দেবার দুঃসহ লোভকে সংবরণ করতে পারে! সে বলছে—"আর তো মিল দেখছিনে, এক আছে 'মুসলমানের রোজা', মোজাকে বললে দোষ নেই যে তুমি ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ, না না ওতে আমার লেখার ক্লাসিক্যাল গ্রেস্‌টা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ, সামান্য মোজার জন্য শান্তিভঙ্গও হতে পারে—ওটা থাক"—আমরাও বলি ওটা থাক, এতেই হবে!

অন্যত্র চন্দ্রদা ও ক্ষান্তমণির মধ্যে যে দাম্পত্য কলহ তাতেও আমাদের মুখে স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে। কলেজ পালিয়ে বাগবাজারের

রাস্তায় মোজাবক্ষে ঘুরতে ঘুরতে গদাইচন্দ্র যখন হাতে নাতে পিতার কাছে ধরা পড়ে যায়, তখন পিতা পুত্রের মধ্যে যে কথাবার্তা চলে তার মধ্যেও যথেষ্ট রসসঞ্চার করা হয়েছে।

* * * * *

সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত[১] 'মুক্তির উপায়' নাটকেও চরিত্রগত রূপায়ণের চেয়ে ঘটনাসংস্থানের কলাকুশলতাই বড় হয়ে উঠেছে। এখানে চরিত্রগুলি অত্যন্ত সাধারণ, তাদের নিজেদের ভিতরেও হাস্যরসের বিশেষ কোনো উপাদান নেই; তাদের কথোপকথনের মধ্যেও wit-এর চমক বা humour-এর স্পর্শ পাওয়া যায় না। চরিত্রগুলিকে কৌশল সহকারে ঘটনাচক্রে এমন একটা situation বা পরিস্থিতির মধ্যে এনে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর রূপ গ্রহণ করেছে। সংসার-অনাসক্ত ফকির 'ঠাণ্ডাজল, হিম ও হাস্য পরিহাস' সহ্য করতে পারত না তাই হাস্যচপলা স্ত্রী ও বিষয় সংসারকে ত্যাগ করে সে একদিন সন্ন্যাসী হয়ে পড়ল। অন্যদিকে মাখনলাল লোকটা নিতান্ত সৌখীন ও চপলপ্রকৃতি, কোনো প্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হতে সে নারাজ। এ হেন লোকের যখন দুই বিবাহের ফলে দুই স্ত্রী এবং আটটি পুত্রকন্যার ভারে দিবারাত্রির শান্তি নষ্ট হতে আরম্ভ হোল তখন সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারল। ঘুরতে ঘুরতে ফকির এসে পড়ল এই মাখনলালেরই গৃহে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অজস্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে মাখনলাল বলে ধরে নিয়ে মাখনের দুই স্ত্রীর হাতে তাকে সমর্পণ করা হোল। এরই ফলে উত্যক্ত হয়ে ফকির যখনই পলায়ন

করবার চেষ্টা করেছে তখনই চারিদিক থেকে সকলেই তাকে যথেচ্ছ গালাগাল দিয়েছে। এর পর এসে জুটেছে আবার মাখনের আটটি সন্তানের নির্মম (?) পিতৃসম্ভাষণ প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিযোগিতা এবং তার সঙ্গে এক পাল শালা ও শালীর অসহ্য ঠাট্টার অত্যাচার।

এখানেও সেই Comedy of Errors, সেই কৃত্রিম ভুল বোঝবার পালা। এই কমেডির শেষ রক্ষা হয়েছে স্বয়ং মাখনের উপস্থিতিতে, মাখন নিতান্ত বীরের মতই ফকিরকে উদ্ধার করেছে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে। এই শেষরক্ষাকে আরও সুষ্ঠু করবার জন্য ফকিরের স্ত্রী হৈমবতীকেও ঘটনাচক্রে এই অভিনয়ক্ষেত্রে এনে ফেলা হয়েছে পারিবারিক সম্বন্ধের ক্ষীণ সূত্র ধরে। ফকিরও পরিণামে হৈমবতীর অঞ্চলাশ্রয়ে 'পুনর্মূষিকো' হয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে।

বিচার করলে দেখা যাবে যে এখানেও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে চরিত্রগুলির স্থান নিতান্তই গৌণ; ঘটনার আবর্তনই মুখ্যভাবে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। স্থায়িত্বের ও রসোৎকর্ষের ভিত্তি হিসাবে এই জাতীয় কৃত্রিম ও আকস্মিক ঘটনাসংস্থান খুব উচ্চস্থান পেতে পারে না।

(ঘ) সাধারণ গদ্যরচনাগুলির মধ্যে জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের স্থানে স্থানে অতি বিশুদ্ধ humour-এর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক রসিকতা বোধ এখানে পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্তিলাভ করেছে, এবং অনেকটা এই কারণেই তাঁর আত্মজীবনী নিছক বিবরণীমাত্র না হয়ে সরস ও সুখপাঠ্য রচনার সন্ধান পেয়েছে। প্রমথ চৌধুরী এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"an undercurrent of mellow humour runs through the whole book"—দু' একটি নিদর্শন দিলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বাল্যজীবনে মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্ত করবার কঠিন প্রয়াসকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলো (এ সময়ে অস্থিবিদ্যাও শেখা চলছিল) এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিনা। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।"[১] গৃহশিক্ষকের অতি অসহ্য রকমের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে প্রত্যেক বালকের মনেই একটা নিরুদ্ধ নালিস থাকে। এক মহাদুর্যোগের দিনে দূর থেকে মাষ্টার মশায়ের কালো ছাতা দেখে রবীন্দ্রনাথও খুব আশাহত হয়েছিলেন। তিনি বলছেন—"ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে—কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাষ্টার মশায়ের সমানধর্মা আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব"[২] সুতরাং এ মাষ্টার মশায় ছাড়া আর কেউ নয়! ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ একবার দুষ্টুমি করে এক জাদুকর বন্ধুর কাছে বালক রবীন্দ্রনাথকে বালিকা হিসাবেই পরিচয় দেয় এবং বলে যে তার বাইরের পুরুষ পরিচ্ছদটা ছদ্মবেশমাত্র! এই নবপরিচয়ের কিছু পরেই জাদুকর বন্ধুর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলে সকলেই সম্ভবত এই রহস্যময় পরিচয়ের ফলে তার সমস্ত কার্যকলাপ মায় আহার পর্যন্ত অসম্ভব কৌতূহলের সংগে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তিনি মন্তব্য করছেন—"যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রাণীবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত!"[৩] এই

---

[১] জীবনস্মৃতি—৪০ পৃষ্ঠা (প্রথম সংস্করণ)
[২] জীবনস্মৃতি—১২ পৃষ্ঠা (প্রথম সংস্করণ) [৩] জীবনস্মৃতি ৭০ পৃষ্ঠা

কাহিনীর চরম পরিণতি উক্ত জাদুকর বন্ধুর নিকট থেকে কয়েকখানি 'অদ্ভুত'—সম্ভবতঃ প্রেমপত্র প্রাপ্তিতে! ইংরেজ অধ্যাপক বাংলা শিখেছেন, এবং এই নবার্জিত জ্ঞানের প্ররোচনায় তিনি নীরদ নামক বালককে হঠাৎ তার নামের ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে বসেন। ফলাফল কি হোলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলাই ভালো। "নীরদ কোনোদিন তার নামের উৎপত্তি লইয়া কিছুমাত্র উদ্বেগ অনুভব করে নাই, কিন্তু নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ীর তলে চাপা পড়ার মতো দুর্ঘটনা—নীরু তাই অম্লানবদনে উত্তর করিল—নী ছিল রোদ অর্থাৎ যাহা উঠিলে রোদ থাকেনা তাহাই নীরদ।"[১] কিশোর বয়সে বিলাত গিয়ে কোনো ইংরেজ ভদ্রলোকের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত বিলাপ গানকে বেহাগ রাগিনীতে গেয়ে শুনাবার যে পালায় তিনি নিতান্ত অসহায়ের মতই জড়িয়ে পড়েছিলেন, তার বর্ণনাটা আগাগোড়াই অতি সরস রঙ্গপূর্ণ। শ্রোতাদের উপর এই বিলাপ গীতের ফল যেমন হোত সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন,—"স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম যে এই গানের ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারও পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম 'How interesting' তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতো বড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে তাহা আমার জন্মকালে বা তাহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।"

জীবনস্মৃতির নানা বর্ণনার মধ্যে এই যে নির্মল হাস্যরসের এত ছড়াছড়ি, একে আমরা বলতে পারি স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস ( Spontaneous

---

১ জীবনস্মৃতি—১১৫ পৃষ্ঠা।

humour)। রঙ্গরসসৃষ্টির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক এগুলি রচনা করেন নি। তবে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা বোধই স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে এখানে বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক রসের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ছিন্নপত্রের মধ্যেও স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় স্বাভাবিক ও স্বভাবসিদ্ধ humour অতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। বোলপুরের বৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পড়ে তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছেন, এর থেকে তিনি যে শিক্ষা পেলেন রসমধুর ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গেই, তিনি তা প্রকাশ করে বলেছেন। তিনি বলছেন—"যাহোক একটা খুব শিক্ষালাভ করেছি—হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্য দিয়ে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এখন আর এরকম মিথ্যে কথা লিখতে পারব না; ঝড়ের সময় কারো মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবেনা সেই চিন্তাই তখন প্রবল হয়ে ওঠে।......যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ী থাকত, আমার চশমা ও কোঁচা সামলাতুম, না; তার স্মৃতি সামলাতুম।"[১]

অন্যত্র লিখছেন,—"কবিরা যাই বলুন আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগেনা। কোমরে বাত হলে চন্দন পঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়—আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা ব'লে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেহই

---

১ ছিন্নপত্র, পত্রধারা ১৩১

বাতের উপর একছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারু বাত হয়নি। আমি লিখব।" আরও লিখছেন,—

"কোমরটাকে যত সামান্য বোধ হোত এখন তো তত সামান্য বোধ হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—কিন্তু কোমর ভেঙে গেলেই মানুষ একেবারেই কাৎ—তার আর উত্থানশক্তি থাকেনা। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও সে কোমরে তার্পিণ তেল মালিশ করবে।"[১] ভ্রমণ যাত্রার আনুষঙ্গিক লটবহর যে অনেক সময়ই যাত্রীর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছেন—"...এই দুর্দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নিচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বার করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে; বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁত লাগে।"[২]

এই জাতীয় রসমাধুর্যের পরিচয় ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে ছড়িয়ে আছে, ব্যাপক দৃষ্টান্ত বাহুল্যমাত্র।

শুধু ছিন্নপত্রের মধ্যেই কেন, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্র প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ডায়ারি এমন কি ব্যক্তিগত পত্রাদিরও রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, সূক্ষ্ম

---

[১] ছিন্নপত্র, পত্রধারা পৃঃ ১৭, ১৮ [২] ছিন্নপত্র, পত্রাবলী পৃঃ ২৮, ২৯

ব্যঞ্জনার সাহায্যে তিনি নির্মল হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন। ইয়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, চিঠি পত্র (বিভিন্ন খণ্ড) প্রভৃতির মধ্যে এই জাতীয় রসব্যঞ্জনার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সরস কথোপকথনের যে স্বাভাবিক art, এগুলি যেন তারই লিপিবদ্ধ প্রকাশ মাত্র। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারিতে বহুবিচিত্র বর্ণনার মধ্যে একজায়গায় লিখেছেন—

"অনতিদূরে একটি বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলাদেশের নবদম্পতির কথা মনে পড়ল। মস্ত একটা চশমাপরা গ্রাজুয়েট-পুংগব, এবং তারই দড়িটা ধরে ছোটো একটি চৌদ্দ পনেরো বৎসরের নোলক পরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।"[১] এর মধ্যে হয়তো ব্যঙ্গের মৃদু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাতে ঝাল নেই, নিছক হাস্য সৃষ্টিই এর উদ্দেশ্য!

ভৃত্যবর্গের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা সস্নেহ প্রীতিময় ব্যবহার ছিল, তা সর্বজনবিদিত। এই ভৃত্যদের কথা প্রসঙ্গে তিনি অনেক সময়েই তার পত্রাবলীর মধ্যে অতি চমৎকার রঙ্গরসিকতার সৃষ্টি করেছেন! কন্যা মীরা দেবীর কাছে লিখিত একখানি পত্রে ভৃত্য উমাচরণ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন—"উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারেনি। পাত্রীর বয়স তিন বছর সুতরাং তিনশো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়, আরো দুই এক বছর কম হলে বোধ করি সেই পরিমাণে

[১] রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৭৮

দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেকদিন ব্রাহ্ম বাড়ীতে কাজ করেছে বলে বাল্য বিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এর জন্য সে অতি কঠোর পণ করেছে যে তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোন মতেই বিয়ে করবে না, প্রাণ গেলেও না,—তার এই সাধু সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেছি—কত দুমাস তিন মাসের মেয়ে তাদের মার কোলে শুয়ে চীৎকার করে কাঁদছে কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতেই কর্ণপাত করবে না, এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল—কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুইচক্ষু মুদ্রিত করে অহোরাত্র ধ্যান করছে কিন্তু তাঁদের এই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারছেনা—ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে শুম্ভিত হয়ে গেছে। তার এই সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তোরা যদি আপনা আপনির মধ্যে তিনশো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস তাহলে এই একটি তিন বৎসরে বয়স্থা মেয়ের আইবুড়দশা ঘুচে যায়। বৌমাকে বলিস তাদের উচিত গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্যটি করা।"

অন্যত্র লিখছেন—"উমাচরণ কলকাতায় ফিরছে—এই একটা সুসংবাদ, তার বিয়ে হয়নি—এই একটা। আগামী সোমবারে শুনচি এখানে তার শুভাগমন হবে। কি রকম অভ্যর্থনা হবে তাই ভাবছি।"[১]

প্রবন্ধ রচনার মধ্যেও তিনি এই স্বচ্ছ রসবোধকে অকৃপণ হস্তে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। স্থানে স্থানে এই রসবোধ মৃদু ব্যঙ্গের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু সে ব্যাঙ্গের ঝাল ও তীব্রতা রস উপভোগের সুষ্ঠু পরিমিতিকে কোথাও ছড়িয়ে যায় নি।

[১] চিঠিপত্র—৪র্থ খণ্ড পৃ ২০-২১

উদাহরণ স্বরূপ বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্গত 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধটিতে ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্যলিপ্সা নিয়ে ব্যঙ্গের মৃদু কটাক্ষ করা হয়েছে কিন্তু সরস রসিকতাই সমস্ত প্রবন্ধটিকে রসসিক্ত করে রেখেছে। এখানে উধ্‌ৃত অংশ থেকেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :

"বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। · দেখা যাক বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায়, তাহারা বোকা।·· ···উদ্ভিজ্জ ভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্ণাম ঘুচে না। নইলে 'বাঁদর' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে তাহাকে নির্বোধ বলা হইল। উদ্ভিদ্‌ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অল্প অল্প বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন। ভাল হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভুমি ও ট্রান্সবাল্ পেটে মূলেই সহিল না।"[১]

(ঙ) ছোট গল্প গুলির মধ্যে এই কৌতুকরস কোথায়ও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে, কতকগুলি গল্প আবার প্রধানতঃ এই রসকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে! 'ইচ্ছা পূরণ' গল্পটির মধ্যে পিতা সুবল ও পুত্র সুশীলের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের যে হাস্যকর পরিণতি তাতে হাসতে হাসতেই আমাদের অনেকের শিক্ষা হবে। 'রাজটীকা'র হবু রায় বাহাদুর নবীন কিশোরের সেই 'শ্যাম ও কুল রাখিবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা' অনাবিল হাস্য রসেরই সৃষ্টি করে—অশ্রু এর মধ্যে

---

১ রবীন্দ্র রচনাবলী-অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড পৃ ৩৪৯

ইংরেজ ঘেষা, খেতাবলোভী বাঙালীদের প্রতি কিছুটা কটাক্ষ আছে, এ কথা বলা যায়। 'দর্পহরণ'-এর নব বিবাহিত স্বামীর বিদ্যার বড়াইয়ের অসারতা স্ত্রীর কাছে অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যায়, তবুও জলমগ্ন ব্যক্তির তৃণাশ্রয় অবলম্বনের ন্যায় মনোবৃত্তির ফলে মরিয়া হয়ে স্বামীপ্রবর সাহিত্য সভার সভাপতি হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সগর্বে স্ত্রীর কাছে তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন—যদিও অদূর ভবিষ্যতের সভার কথা কল্পনা করলে এই কথাই বার বার তার মনে পড়ে যায়—

> মনে কর শেষের দিন কি ভয়ংকর
>
> অন্যে বাক্য কবে ( কিন্তু ) তুমি রবে নিরুত্তর !

স্বামী বেচারার এই করুণাবহ অবস্থা আমাদের মনে নির্মল হাস্যেরই উদ্রেক কর।

'ঠাকুর্দা' গল্পটিতে হাস্যরস ও করুণরসের অতি চমৎকার সমন্বয় হয়েছে, রসবিচারে এই গল্পটির স্থান স্বভাবতঃই অতি উচ্চে।

( চ ) হাস্য কৌতুকের ছোট ছোট হেঁয়ালি নাট্যগুলি এবং ব্যঙ্গ কৌতুকের অন্তর্গত 'সারবান সাহিত্য', 'মীমাংসা' 'লেখার নমুনা' 'বিনি পয়সার ভোজ', 'নূতন অবতার', 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', 'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'বশীকরণ' নিছক হাস্যরসের নিদর্শন হিসাবেই রসবিচারে স্থান পাবে।

'সারবান সাহিত্যে'র "শ্রীজনহিতৈষী সাহিত্যপ্রচারক" মহাশয় বাংলা সাহিত্যে সার পদার্থের অভাব দেখে" বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে নাটক উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ণ করিতে প্রবৃত্ত" হয়েছেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি 'পঞ্জিকা নাট্যাকারে' প্রকাশ করতে চান এবং তারই কিছু নমুনা

দিয়েছেন এবং এই বলে আরও আশ্বস্ত করেছেন যে "ভবিষ্যতে সুশ্রুত ও চরকসংহিতা নাট্যাকারে রচনা করিবার অভিলাষ আছে এবং উপন্যাসের ন্যায় লঘু সাহিত্যকে কতদূর পর্যন্ত সারবান করিয়া তোলা যাইতে পারে, পাঠকদিগকে তাহারও কিঞ্চিৎ নমুনা দিবার সংকল্প করিয়াছি।"

'মীমাংসা'য় জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে! "আমার এ কী হইল। এ কী বেদনা। নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া 'চমকি চমকি' উঠি'।

কমল পত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দন পঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।...মনোহরা শারদ পূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী—কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বর্ত্তাইয়া তোলে।"...আমার এ কী হইল।" সমস্যার একমাত্র সমাধান—"তোমার বাত হইয়াছে। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ওই এক লক্ষণ।"

একমাত্র 'আর্য ও অনার্য' নামক রচনাটিকে বাদ দিলে হাস্য কৌতুকের সব রচনাগুলিই শুদ্ধমাত্র কৌতুকরসকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ গুলিকে কৌতুকনাট্য বা নাট্য কৌতুক বলেই বর্ণনা করেছেন। সাধারণতঃ হাস্যরসের ভিতর দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত হেঁয়ালীকে প্রকাশ করাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য। এই হেঁয়ালীকে বজায় রাখার চেষ্টা প্রাধান্য পাওয়ায় এই নাটিকাগুলির আশ্রিত হাস্যরস বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও 'একান্নবর্তী', 'আশ্রম পীড়া' 'অন্ত্যেষ্টিসংকার', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' প্রভৃতি রচনাগুলিতে আমরা প্রাণভরে হাসবার অবকাশ

যথেষ্ট পেয়ে থাকি। তবে উপাদানের লঘুত্ব এবং অল্পতার জন্য এই রসের আবেদন কোথায়ও স্থায়ী ও গভীর হয়ে ওঠেনি।

'আষাঢ়ে'র (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত) সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন,—"শুদ্ধমাত্র অমিশ্র হাস্য ফেনরাশির মত লঘু এবং অগভীর, তাহা বিষয়পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী বর্ণপাত মাত্র। কেবল সেই হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না। রূপালি পাতের মধ্যে শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আছে বটে কিন্তু তাহার লঘুত্ব এবং অগভীরতা বশতঃ তাহার মূল্যও অল্প এবং তাহার স্থায়িত্বও সামান্য। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে রৌপ্যপিণ্ডের কাঠিন্য ও ভার থাকিলে তবেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায়। হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়।'[১] হাস্য কৌতুকের এই রচনাগুলির মধ্যে রৌপ্য পাতের উজ্জ্বলতা আছে কিন্তু রৌপ্য পিণ্ডের কাঠিন্য ও ভার নেই, এতে ভাব ও চিন্তার গভীরতার অভাব আছে। ব্যঙ্গ কৌতুকের পূর্বোল্লিখিত রচনাগুলিও এই দোষের দ্বারা দুষ্ট।

'বশীকরণ' নাটিকাটিকে আমরা এক হিসাবে 'শেষরক্ষা' ও 'মুক্তির উপায়'-এর সঙ্গে একত্রে বিচার করতে পারি। ঘটনা সংস্থানের দিক দিয়ে দেখলে এদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। 'বশীকরণে'র রসসৃষ্টির সমস্ত উপাদান নির্ভর করছে ঘটনা সংস্থানের কুশলতার উপর, চরিত্রগত কোনো বৈশিষ্ট্যের উপর নয়। এখানেও সেই Comedy of Errors-ভুল ভ্রান্তির পালা—হাস্যরসের শ্রেণী বিচারে একেও আমরা উচ্চ স্থান দিতে পারিনা। তাছাড়া স্বগতোক্তির

---

১ আধুনিক সাহিত্য—'আষাঢ়ে'

প্রবর্তনার ফলে এখানে নাটকীয় মূল প্রকৃতিরও রসহানি হয়েছে এবং এই স্বগতোক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে হাস্যরস সৃষ্টির যে ব্যবস্থা তাকেও খুব উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলা যায় না। অবশ্য অভিনয়ে এই জাতীয় নাটকগুলি খুবই জমে, Situation (ঘটনাসংস্থান)-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কথোপকথনের টানা পোড়েন নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করে তোলে।

কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাটির কথাও এখানে বলা প্রয়োজন : ইচ্ছা পূরণ গল্পের পিতা পুত্রের মত এখানে রাণী ও দাসীর স্থান পরিবর্তন হোল স্বপ্নের প্রসাদে এবং লক্ষ্মীর কৃপায়। তারপরই সুরু হোল বললুব্ধা অযোগ্যা দাসীর হাতে রাণী গিরির অশেষ লাঞ্ছনা। ঐশ্বর্যকে কেবল আকড়ে ধরলেই চলেনা, তাকে উপযুক্ত কাজে লাগাবার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও মনোবৃত্তি থাকা চাই; ক্ষমতাকে শুধু পেলেই হয় না, তাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করবার মতো মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন— এই নিগূঢ় সত্যই 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে চমৎকার রসকাহিনীর ভিতর দিয়ে। ঐশ্বর্যলোভে মত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার-কারীদের প্রতি একটু মৃদু ব্যঙ্গ কটাক্ষের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায় বলা যেতে পারে।

> "এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ
> ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।"

(ছ) নিছক হাস্যরসমূলক কয়েকটি কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কল্পনার সর্বজনপরিচিত 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি এই জাতীয় রচনার অন্যতম নিদর্শন।

"কহিলা হবু,—শুনগো গবু রায়
কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র,
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।"

সুতরাং—

"শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"
"শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হ'ল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখচুণ,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।"

এ হেন জটিল চিন্তাসমস্যার সমাধানের ভার শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ল নিতান্ত গণ্ডমূর্খ চামার দলপতির উপর, সে তার সহজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে সবিনয়ে ক্ষণমাত্রেই এই সমস্যার সমাধান করে দিল—

"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কিন্তু সমস্যার এত সহজ সমাধানে অতি-বুদ্ধিমানদের মন ওঠে না—

"কহিল রাজা, এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশশুদ্ধ।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সহজ বুদ্ধিকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

তথাকথিত পণ্ডিতদের সহজ জিনিষকে জটিল করে তোলবার যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া এবং অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের অন্তরালে সাধারণ সহজ জ্ঞানের

যে একান্ত অভাব সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে, এই কবিতাটিতে অতি সুন্দর হাস্যরসের অবতারণার আবরণে সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে। তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্যদের অসহনীয় আত্মম্ভরিতারও ইঙ্গিত এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

"মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।"

মানসীর 'শ্রাবণের পত্র' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত রসরসিকতা—যার পরিচয় আমরা তাঁর জীবনস্মৃতি ও ছিন্ন পত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি—তারই ছন্দোবদ্ধরূপ ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একখানা গদ্য পত্রের উপসংহার মাত্র।[১]

"পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়, এসো চট্‌পট্‌!
শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি করো ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌।
... ... ... ...
ছুটি লয়ে কোনোমতে, পোর্টম্যান্টো তুলি' রথে,
সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি',
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।"

বহুপূর্বে নাসিক প্রবাসকালে কলকাতায় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রের কথাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১। পত্রধারা—ছিন্নপত্র, পৃষ্ঠা ২২

আধাবাংলা ও আধাহিন্দিতে রচিত এই পত্রখানি অনাবিল কৌতুক-রসের চমৎকার নিদর্শন। কিছু কিছু উধৃত করা গেল।

...কলকাতামে চলা গয়োরে সুরেনবাবু মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুর সেরা।
বুড়া সাবকো কায়কো নহি পাতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মাহিনাভর, কুছ খবর মিলেনা, ইয়েত নহি আচ্ছা।

... ... ... ...

সর্বদা মন কেমন কর্‌তা কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়,
ভাত খাতা ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়।
মন্‌কা দুঃখে হু হু করকে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গালাকা জবানী।
মেরা উপর জুলুম করতা তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা, কোথায় যাঙ্গা, ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোরসে গাল টিপতা দোনো আঙ্গলি দেকে,
বিলাতি এক পৈনি বাজানা বাজাতা থেকে থেকে।
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিমটি কাটতা,
কাঁচি লেকর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সব ছাটতা
জজ সাহেব কুচ বোলতা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজসাহেবকি বেটা!

... ... ... ...

চিঠি লিখিও, মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

পূর্বোক্ত শ্রাবণের পত্রের তুলনায় এটির অন্তর্গত হাস্যরস যে অনেকটা নিম্নশ্রেণীর একথা স্বীকার করতেই হবে। নিছক অতি

সাধারণ রঙ্গকৌতুকের সৃষ্টি করা ছাড়া এর কোনো সার্থকতা চোখে পড়েনা এবং স্থান ও পাত্র নির্বিশেষে এর নিজস্ব সাহিত্যমূল্যও কিছু নেই। হয়তো এই কারণেই ভারতীতে (ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৩) প্রকাশিত হবার পর এটি কোনো গ্রন্থে স্থান পায়নি। পরবর্তী কালে রচিত প্রহাসিনীর অন্তর্গত কবিতাগুলির সঙ্গে এর ভঙ্গীগত ও রসগত মিল দেখা যায়।[১]

ক্ষণিকার অনেকগুলি কবিতা বিশেষতঃ 'কর্মফল,' 'কবি,' 'যথাস্থান' প্রভৃতি কবিতাগুলি একটা সবল রসিক মনোবৃত্তি নিয়ে রচিত। এদের অন্তর্নিহিত গভীর ভাবগুলিকে একটা সহজ রসের আবরণে প্রকাশ করা হয়েছে। দুই একটি কবিতায় একটুখানি মৃদু কটাক্ষ ইঙ্গিতের পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'কর্মফল' কবিতায় কবি বলছেন—

"পরজন্ম সত্য হলে, কী ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে বাংলা দেশের এ রাজধানী,
গন্ত পন্ত লিখুন কেঁদে, তারাই আমায় আনবে বেঁধে
অনেক লেখার অনেক পাতক সে মহা-পাপ করতে মোচন
আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখা সমালোচন।"

এবং

ততদিনে দৈবে যদি পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ এমনি কটু বলব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে দগ্ধ করব পাতে পাতে
আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।"

১ বর্তমানে প্রহাসিনীর সংযোজন অংশে এটি স্থান পেয়েছে

এই সূত্রে বিসর্জনের উৎসর্গ পত্রটিও উল্লেখযোগ্য। কর্মফলের মধ্যে যে কথার ইঙ্গিতমাত্র আছে এখানে সেটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এটি কিছুমাত্রায় ব্যঙ্গ-রসাশ্রিতই হয়ে পড়েছে। লেখক নিজের মনে তাঁর 'কল্পনার ধনগুলি'কে তাঁর রচনার মধ্যে জীবন্ত করে তোলেন। তারপর একদিন এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখনই শুরু হয় 'মহা ঝালাপালা'। তখন

"রক্ত মাংস গন্ধ পেয়ে, ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।
শির নাড়ি কেহ কহে, "সবসুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হত আরো ভালো হলে।"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা বলে।"
কেহ বলে, "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হত যদি অন্য কোন রূপ।"

এই বিচিত্র কলকোলাহলের মধ্যে যেখানে "যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়," কবি নীরবেই থাকেন। কারণ তাঁর মতে এই "ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি" অর্থহীন। তিনি জানেন যে,

"আইনের লৌহছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।"

কণিকার Epigram জাতীয় কাব্যকণিকাগুলিতেও মৃদু কটাক্ষ

ইঙ্গিত মিশ্রিত হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব জগতের নানা অযৌক্তিকতা, ব্যবহারিক জীবনের নানা অসংগতি, নানা প্রত্যক্ষ গভীর তত্ত্বকথা এগুলির মধ্যে হাস্যরসাশ্রিত রূপক অলংকারের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।"

নাটকগুলির মধ্যেও এই শ্রেণীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রঙ্গরসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাজা ও রাণী' নাটকে প্রজাবর্গের কথোপকথন, 'বিসর্জন'-এ পূজার্থীদের আত্মম্ভরিতার পাল্লায় পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা, 'বাল্মিকি প্রতিভা'য় ডাকাতদলের, বিশেষতঃ প্রথম ডাকাতের কথাবার্তা, 'শারদোৎসব'-এর অর্থলোভী লক্ষেশ্বর এবং 'ফাল্গুনী'র দাদা প্রভৃতি চমৎকার অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

(জ) সাময়িক প্রয়োজনে বা কোনো বিশেষ সংঘ প্রভৃতির উদ্যোক্তাদের তাগিদেও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি হাস্যরসমূলক গান রচনা করেছেন। হাস্যরস সৃষ্টিতে এ গুলির দাবীও কম নয়। 'চা চক্রে'র চা-পিয়াসীদের পরিচয়কে তিনি যেভাবে গানের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলেছেন, অনাবিল হাস্যরসের উৎস হিসাবেই সেটি সর্বজন পরিচিত। 'হৈ হৈ সংঘ'-এর আত্মপরিচয়-সূচক গানগুলিও নিছক হাস্যরসসৃষ্টির অতুলনীয় উপাদান।

"কাটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী
তারি পদ সেবি করি তাহারি ভজনা,
বদকণ্ঠ লোকবাসী আমরা কজনা।
সতোরো পুরুষ গেছে, ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মর্চে ধরা বেসুর বিধুরা,
বেতার সেতার দুটো, তবলাটা কাটাকুটো,
সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা।"

অন্যত্র,

"না গান গাওয়ার দলরে আমরা না গলা সাধার
মোদের ভৈরো রাগে রবির রাগে মুখ আঁধার।
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি।
আধখানা সুর লাগাই যদি বসন্তবাহারে,
তৎক্ষণাৎ আহারে,
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদ তাপ পালায় শ্রীরাধার।"

তাই সংগীতজ্ঞদের তারা আগে থাকতেই সৎপরামর্শ দেয় যে প্রাণের মায়া থাকে তাহলে—

"ওরে ভাই গাইয়ে,
হৈ হৈ পাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিণী রাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।"

এ হেন ওস্তাদ গাইয়েদের ভবিষ্যৎ যে নিতান্তই অন্ধকার এতো জানা কথা! তাই এক সময় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাদের বলতে শোনা যায়—

"ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ,
তিনটে চারটে পাশ করেছি নই নিতান্ত মুরুখ।
তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়
বুদ্ধি আমার যেমনই হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম।"

কাজে কাজেই—'বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে' এবং আরও মর্মান্তিক দুঃখ এই যে—'স্বয়ং প্রিয়া বলেন, তোমার গলা বড়ই রুক্ষ্ম।'

মাসিক পত্রাদির পাতায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কোনো কোনো কবিতায় এই জাতীয় রঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও প্রধানত: কোনো ঘটনা বা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই রচিত। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত ধ্যানভঙ্গ কবিতাটি এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

"পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবী, রেজেষ্টারি চিঠি,
বাজে কথা কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনার পদ্মে দেবী লাগান মোটর চাকা
এমন দৌড় মারেন তখন, মিথ্যে তারে ডাকা।

... ... ... ...

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত মুনিঋষির ভেঙে দিতেন ধ্যান,
ভাঙন কিন্তু আর্টিষ্টিক, কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হ'ত দেবতাদিগের পক্ষে।

... ... ... ...

ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া,
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটারি, নয় মেনকা-রম্ভা
রিয়ালিষ্টিক আধুনিকের এই মতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা,
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু জানি ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ,
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূল হস্ত-অবলেপের দুঃখ
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম।"[১]

বাইরের নানা প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের তাগিদে কবি যে সময় সময় সত্যই বিব্রত হয়ে পড়তেন এবং এতে করে তার কাব্য-সাধনাতেও যে ব্যাঘাত ঘটত, রঙ্গরসের অন্তরালে ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রহাসিনীর প্রায় সব কবিতাগুলিই নিছক হাস্যরসমূলক, অধিকাংশই কাউকে না কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা পত্রের পদ্যরূপ মাত্র।

---

১ বঙ্গলক্ষ্মী—ভাদ্র, ১৩৪৬ ( বর্তমানে প্রহাসিনী সংযোজন। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২৩শ খণ্ড )

'ভোজনবীর', 'ভাই দ্বিতীয়া', 'অপাক বিপাক' এবং 'অনাদৃতা লেখনী'—এই ক'টি কবিতার পিছনে কোনো ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ না থাকলেও এখানেও স্বাভাবিক রসকৌতুকের যথেষ্ট পরিচয় আছে। 'অপাক বিপাক' এর পিছনে পরোক্ষে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভোজনপর্বের করুণ পরিণতির কাহিনী সুন্দর রসব্যঞ্জনার মধ্যে রূপ নিয়েছে।

"চলতি ভাষায় যাকে ব'লে থাকে আমাশা
যতদূর জানা আছে সেটা নয় তামাসা,
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো।"

'ভোজনবীর' কবিতায় ভোজ্য বস্তুর বর্ণনা খুব লোভনীয় হলেও বীরের শেষ পরিণাম বিশেষ করুণা ব্যঞ্জক!

"লঙ্কা আনো. সর্ষে আনো সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তাহার হোয়োনা শঙ্কিত।
আঁচল ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাধো,
বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত।"

'এ তো বড় রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত 'রঙ্গ' কবিতাটি প্রথম শ্রেণীর প্যারডি ( Parody ) রচনার একটা সুন্দর নিদর্শন। এটিও নিছক হাস্যরসমূলক।

"এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার মিথ্যে দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।"

'গৌড়ী রীতি' কবিতাটিতে রঙ্গরসিকতার অন্তরালে একটু মৃদু ব্যঙ্গকটাক্ষের আভাস পাওয়া যায়।

"নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
দাতা বটে ষোলো আনা।
সামনে আসিয়া নত্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়
পিছনে পিছনে নিন্দারোপণ
ধন্য ধন্য গৌড়।"

সাধারণ মানুষের, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর, মনস্তত্ত্বের অতি সহজ ও সুন্দর বিশ্লেষণ কবিতাটিকে অতুলনীয় করে রেখেছে! এতে কটাক্ষ কিছু থাকলেও তাতে আঘাতের কোনো প্রয়াস নেই। নিতান্ত সত্য এবং কৌতুকাবহ আত্মবিশ্লেষণাত্মক এই পরিচয়ে গৌড়বাসীর মুখে হাসিই ফুঠে ওঠে।

অন্যান্য দুই একটি কবিতাতেও হাসির অন্তরালে কটাক্ষ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'নারীর কর্তব্য"[১] কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা দেশের সাধারণ নারী জীবনের

---

১ প্রহাসিনী-সংযোজন।

একটা বাস্তব ছবি এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। 'হাতা বেড়ি খুন্তি'ই যে নারী জীবনের চরম সার্থকতার আদর্শ, যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও অশিক্ষার বাইরে পা বাড়ানো যে তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ ও স্বেচ্ছাচার,— রক্ষণশীল প্রগতি-বিরোধীদের এই মতবাদের বিরুদ্ধেই এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে।

"মেয়েরা বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশনাল কালচারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা ; বঙ্গনারী ধরেছে সেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস করে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার
শীতলামায়ীরে করে হেলা,
বসন্তের টিকা নেয় ; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।"

প্রহাসিনীর কবিতাগুলির এই যে রঙ্গরস, humour-এর জাত বিচারে এ খুব উচ্চ পর্যায়ে স্থান পাবে না। নিছক রঙ্গ কৌতুকই এই কবিতাগুলির একমাত্র উপজীব্য। প্রকৃষ্ট হাস্যরসের মধ্যে যে একটা অন্তরালবর্তী Seriousness, একটা ভাবের গভীরতা ও চিন্তার ঔজ্জ্বল্য থাকে, এগুলিতে তার বিশেষ পরিচয় নেই।

(৪)

(ক) প্রহাসিনীর মধ্যে যে নিছক রঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়, তারই মাত্রাধিক্য হলে সৃষ্টি হয় 'nonsense' বা 'আবোল তাবোল' শ্রেণীর রচনা। রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্টিপ্রবণ প্রতিভা অপূর্ব তীক্ষ্ণতা ও কুশলতার সঙ্গে এই শ্রেণীর রচনাগুলিকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সঞ্চারে রসবস্তু করে তুলেছে। খাপছাড়া, ছড়া, সে, গল্পসল্প—গদ্যে ও পদ্যে, প্রভৃতি রচনাগুলির, বিশেষত ছড়ার, মূল আশ্রিত রস এই আবোল তাবোল শ্রেণীগত।

খাপছাড়ার উৎসর্গ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে,
তোমরা যতই হাসো রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোকটাও অল্পনা।"

বিচিত্র সৃষ্টিশীল কবিকল্পনার এই যে 'অনাসৃষ্টির ঝোক', এর ফলে যে একটা নতুন রসসৃষ্টির অজস্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সে কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তেই স্বীকার করব। অনাসৃষ্টিকে সৃষ্টি-পর্যায়ে তোলবার যে রসবস্তু কলাকৌশল তাতে তিনি অসাধারণ বৈচিত্র্য এনেছেন। পরিণত জীবনের ছায়ায় বসে কবিপ্রতিভার এক অপূর্ব্ব খেলা যেন এগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই রচনাগুলি অবলম্বন করে চিরসুন্দর শিশু জীবনের বিচিত্ররসলীলার মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের চিরনবীন কবিপ্রাণ নবসৃষ্টিমুখর হয়ে উঠেছে।

পরিণত বয়স্কের পক্ষে শিশুজীবনের বিচিত্র ভাবজগতের ক্ষেত্রটা বিপদ্‌জনক। কারণ সামান্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই এখানে রসসৃষ্টি

'ছ্যাবলামির' পর্যায়ে গিয়ে পড়বার আশংকা থাকে। ঠিক শিশুদের মন নিয়ে, তাদেরই মত করে সাহিত্য রচনার যে art তা আপাত-দৃষ্টিতে সহজসাধ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথের কথায়,—

> "কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
> যা'-তা' লেখা তেমন সহজ নয়তো।"[১]

কিন্তু তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা সূক্ষ্ম অনুভূতি কল্পনার সাহায্যে এই কঠিন সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছে। "ছেলেমিতে সিদ্ধ" মনের যে সতেজ ও সহজ পরিচয় এই রচনাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা মুগ্ধ বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে। নিপুণ জাদুকর যেমন তার জাদুমন্ত্রে অতি সামান্য উপকরণের সাহায্যে সহজেই খেলা জমিয়ে তোলে, তেমনি এই কুশল শব্দ-জাদুকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা শব্দচিত্রের সাহায্যে "ক্ষণকালের ভোজবাজির ঠাট্টা"কে জমিয়ে তুলেছেন। ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি থেকে আরম্ভ করে চিনুলাল হরিরাম মোতিভয় প্রভৃতি নানা চরিত্রের অদ্ভুত শব্দচিত্রণে যে অনাবিল কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু যে ছোটরাই আনন্দ পাচ্ছে তা হয়, তেমন করে পড়লে বড়রাও এর অন্তর্নিহিত স্বতঃস্ফূর্ত রসের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হবেন না।

(খ) গদ্য রচনায় 'সে' এই আবোল তাবোলের রসকে ফুটিয়ে তুলেছে। ছেলেভুলানো গল্পের যে গতানুগতিক পথ রবীন্দ্রনাথের চিরনূতন চিত্ত তাকে স্বীকার করে নেয়নি। তিনি বলছেন,—

---

১ খাপছাড়া

"আমার খেয়াল ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

নিয়মের বেড়া ভেঙে কবিচিত্তের এই যে এক নতুন খেয়ালখুসীর ছবি, তার মধ্যে স্থানে স্থানে আজগুবি কল্পনার উদ্দাম লীলা আছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সৃষ্টির রসপরিচয় আছে। ভাষায় গড়া মানুষ বানাবার কাজ তিনি নিয়েছেন, এগুলি 'নিছক খেলার মানুষ।' কিন্তু এই খেলার মানুষ 'সে' কে আশ্রয় করে যে রসসৃষ্টি হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

বাস্তব ও অবাস্তবের অপূর্ব মিশ্রণের আলো আঁধারির মধ্য দিয়ে অনেক পরিচিত চরিত্রও সত্তর বছরের দাদামশায় ও ন'বছরের নাৎনীর এই গল্পের আসরে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং বিচিত্র কাহিনী কল্পনার সাহায্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সরল বর্ণনাও এই রসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। "কাজের স্বর্গে"র নানা দাবীদাওয়ার মধ্যে পড়ে কবির কল্পনা স্বর্গকে যে অনেক সময়েই বিদায় দিতে হোত, এবং এই জাতীয় দাবীদাওয়ার অত্যাচার সময়ে সময়ে যে তাঁকে অতিষ্ট করে তুলত—তাঁরই বাস্তব অভিজ্ঞতা রসপূর্ণ বর্ণনার মধ্যে একস্থানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি বলছেন, "বাংলাদেশে সরকারী সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সঙ্গীতসভা, কচুরিপানা ধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্য-শোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষু-ছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা,

খনার লুপ্তভিটা সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতি-সাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষনী সভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টংকার-তত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিত পাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকাব গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেষ্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে", এবং এমন কি, "পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।" পূর্বোল্লিখিত বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত ও প্রহাসিনীতে সংযোজিত ধ্যানভঙ্গ কবিতাটির সঙ্গে এর ভাবগত মিল পাওয়া যাবে। এই জাতীয় বিচিত্র কাহিনী ও গল্পরচনার ফাঁকে ফাঁকে ছড়াকবিতার যে অবকাশ তার সুযোগে স্থানে স্থানে রস আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

'সে'-র উৎসর্গ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুঁল ফোঁটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।"

তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিবহুল কাব্যকাননের শেষ প্রান্তে নবসৃষ্ট এই যে কাব্যকুসুম, লেখকের স্বাভাবিক বিনয়বোধ তাকে 'বনশ্রীর মর্যাদাবিহীন

তুচ্ছ ফুল' বলে অভিহিত করলেও প্রকৃত সাহিত্যরসিক পাঠক সমাজে একে কখনও তুচ্ছ বলে মনে করবেনা এবং সাহিত্য মর্যাদাতেও এর দাবী তাদের কাছে নিতান্ত কম হবেনা।

গল্পসল্প এই জাতীয় সৃষ্টির চমৎকারিত্বের চরম নিদর্শন। কবির লেখনীর মুখে এখানেও অনেকগুলি বিচিত্র চরিত্র ধরা পড়েছে, তাদের নানা বৈশিষ্ট্য আমাদের আনন্দ জুগিয়েছে। এক্ষেত্রেও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ছন্দের বাঁধনে কথা ধরা পড়েছে।

রসরচনা হিসাবে গল্পসল্প আবোল তাবোল শ্রেণীভুক্ত হলেও তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কৌতুকরসের অন্তরালে এখানে স্থানে স্থানে গভীর ভাবইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিছক হাস্যকর কবিতা এবং কৌতুককর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এখানে অন্যান্য ধরণের কবিতা ও গল্পেরও সমাবেশ হয়েছে এবং সেগুলির অন্তরালে নানা serious চরিত্র নানা গভীর তত্ত্ব এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে আত্মভোলা বিজ্ঞানবিদ্ নীলমণিবাবু, বিশ্বনিন্দুক চণ্ডীবাবু, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাচস্পতি মুন্‌সীজি এবং মুক্ত কুন্তলার অভিনয় কাহিনী নিছক কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছে; অন্যদিকে 'ধ্বংস' গল্পটিতে আধুনিক রণোন্মাদনার বিভীষিকাকে গভীর বেদনা বোধের সঙ্গে একটি ছোট কাহিনীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, 'বড়ো খবর' গল্পটিতে যে সামাজিক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে ভাবিয়ে তোলবার খোরাক যথেষ্ট আছে—রূপক কাহিনীর অন্তরালে ভাবের গভীরতা প্রকাশই এগুলির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ছাড়া রাজরাণী পরী আরো সত্য, চন্দনী প্রভৃতি নিছক শিশুপ্রিয় রূপকথা কাহিনী এবং সেই সঙ্গে মিল রেখে রচিত কয়েকটি কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে।

গল্পসল্পের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদ মুনির এই সাজ
তাইতো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

হাল্‌কা গল্পের মধ্য দিয়ে 'মন্দ সে মন্দই' আর 'ভালো সে ভালোই' এই চিরন্তন সত্যকেই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কাজটা তাঁর প্রতিভার পক্ষে কম চেষ্টার হলেও আমাদের পক্ষে এর রস-আবেদন যথেষ্টই।

এই সূত্রে 'গল্পসল্প' সম্বন্ধে লেখকের নিজের মতামত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রচনাগুলির মূলগত সুরকে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি ভাবে দেখেছেন তার পরিচয় আমরা তাঁর রচনাতেই পাই। এই 'গল্পসল্পে'র একমাত্র শ্রোত্রী কুসমির প্রশ্নের উত্তরে গল্পকার বলছেন,— "অনেকদিন ধরে আমি গম্ভীর পোষাকী সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় পরে হাঁপ ছেড়েছি।"[১] দীর্ঘ কাব্য সাধনার শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টামানস এই ভাবে ছেলেমানুষির ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্রের মধ্যে যেন বিশ্রাম খুঁজে পেয়েছে। পরিণত জীবনে 'ছেলে মানুষির দোসর' পেয়ে তাঁর নিজের বাল্যজীবনের শত স্মৃতি নতুন করে উপভোগ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি আজ ধন্য। জীবনস্মৃতির মুন্‌সি, ম্যাজিসিয়ান বন্ধু, সেই রাজবাড়ির কল্পনা, সেই বাল্যসঙ্গিনী, সবই এখানে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। এই গুলিকে অবলম্বন করেই পরিশ্রান্ত কবিজীবনের এই বিশ্রামবিলাস।

---

১ গল্পসল্প—পৃ ৪৫

গল্পসল্পের শেষ কবিতাটি এক হিসাবে কবির আত্মপ্রদক্ষিণ। জীবনসায়াহ্নের ধূসর ছায়ার আভাস এই কবিতাটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ জীবনের হাসি-কান্নামুখর লীলাবৈচিত্র্যের অবসানে কবি এখন প্রশান্ত ধৈর্যের সঙ্গে জীবনসন্ধ্যার অপেক্ষায় আছেন। জীবননাট্যের শেষে আঁধার যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে, জীবনের হিসাবনিকাশ দেবার জন্য কবি প্রস্তুত।

> সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
> নাট্য শেষের দীপের মালা,
> নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
> রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা,
> ঝাপসা চোখে যায়না দেখা,
> আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
> সময় হয়ে এল এবার
> স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
> নেবে আসছে আঁধার যবনিকা,
> খাতা হাতে এখন বুঝি
> আসছে কানে কলম গুঁজি'
> কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।"

( ৫ )

(ক) রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এখন এই হাস্যরস সৃষ্টির উপায় হিসাবে কি কি উপাদানকে তিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করেছেন তারই কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণ শব্দশিল্পী। প্রচলিত শব্দসম্ভারকে তিনি নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন, তাছাড়া অনেক নতুন শব্দ সৃষ্টিতেও তার কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর মধ্যে আমরা সাহিত্যিক ও শিল্পীর একটা সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই।

ভাবকে সুষ্ঠু ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গেলে ভাষায় সৌষ্ঠবের প্রয়োজন ঘটে। ভাষার কলাকুশলতার উপরই ভাবের পূর্ণস্ফূর্তির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। রবীন্দ্র-সাহিত্য একদিকে যেমন ভাবৈশ্বর্যে প্রাণবন্ত, অন্যদিকে তেমনি ভাষাসৌষ্ঠবেও সুসজ্জিত। তাঁর কবিতায়, তাঁর প্রবন্ধে ভাবের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার শিল্পচাতুর্যও লক্ষ্যণীয়। হাস্যরসমূলক রচনাতেও তিনি এই ভাষা ব্যবহারের সুনিপুণ কলাকৌশলের উপর অনেকটা নির্ভর করেছেন।

সাহিত্য ভাবের শব্দচিত্র মাত্র। সুতরাং সাহিত্যের যে রসসৃষ্টি তা অনেকটা নির্ভর করে এই ভাষার সুনির্বাচনের উপর। কোনো চরিত্রকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে হ'লে, কোনো ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে জীবন্ত করে তুলতে গেলে, ভাষাশিল্পের উপযুক্ত ব্যবহারকেই আশ্রয় করতে হয়। হাস্যরস সৃষ্টি করতে হলে সাধারণতঃ কোনো চরিত্রের মধ্যে যে অসংগতি, তার কথাবার্তা ভাবভংগীর মধ্যে যে অযৌক্তিকতা তাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হয়। এই অযৌক্তিকতা ও অসংগতিকে ঠিকমত বুঝতে পারলে তবেই আমরা কৌতুক অনুভব করি। সুতরাং কৌতুকরসকে উদ্‌বুদ্ধ করতে গেলে ভাষাচিত্রেরই উপর অনেক বেশি জোর দিতে হয়। লেখকের মনে হাস্যকর চরিত্রের যে কল্পনা তাকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করবার একমাত্র উপায় ভাষা। 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ, 'গোরা'র কৈলাস—সবগুলি চরিত্রই আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে

উঠেছে তাদের বাণীচিত্রের মধ্য দিয়ে। শব্দের কলাকুশলতার ভিতর দিয়েই আমরা সহজে তাদের অন্তরটিকে ঠিক চিনে নিতে পারি।

রসসৃষ্টির উপায় হিসাবে অন্য এক শ্রেণীর চরিত্র চিত্রনেও এই শব্দ মূল্যের আরও সুষ্টু ও যথার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। আগেই বলেছি যে এক শ্রেণীর রসিক ব্যক্তিরা তাদের রসপূর্ণ কথোপকথনের দ্বারাই রসসৃষ্টি করে থাকেন, উদাহরণ স্বরূপ চিরকুমার সভার অক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে। এই জাতীয় রসিক চরিত্র গুলির রসিকতার মূল অস্ত্র তাদের ব্যাংগার্থপূর্ণ বা রসাত্মক বাক্য, এই শব্দ ব্রহ্মেরই বিচিত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়ে তারা তাদের রসরসিকতাকে পূর্ণ স্ফূর্তি লাভের সুযোগ দেন এবং এই ভাবেই রসসৃষ্টিও করে থাকেন।

মোটকথা শব্দ ও বাক্যের বিচিত্র ব্যবহারই রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরসসৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

বাক্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ, শব্দের পিছনে যে ঝংকার তাতে করেই অনেক স্থানে রসমাধুর্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

নানাক্ষেত্রে অনুপ্রাসকেই হাস্যরসসৃষ্টির সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অজস্র নিদর্শন থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করলেই বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবে।

"আঃ কি বর বর করছিস্?

ওকে ঐ জন্যেই যে বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের ক'টি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই।" (চিরকুমার সভা)

"দেখেই বোঝা গেল সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার ব্রত-রক্ষা করতে গিয়ে সে বিব্রত হবে।" (ঐ)

"হৃদযন্ত্রের বাসা যে পাকযন্ত্রের উপরেই একথা কবিরা মানে না কিন্তু কবিরাজরা মানে।" ( শেষরক্ষা )

দ্বিতীয়তঃ, অলংকার পারিপাট্য। রূপক ও অলংকারের অপূর্ব শিল্পিত ব্যবহারেই নানাস্থানে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটির উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

"সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, যাকে একবার ধরে—ওর নাম কি—তাকে সহজে ছাডতে চায়না—আহা, অমন জিনিষ কি আর আছে।" ( বৈকুণ্ঠের খাতা )

"ছেলেবেলায় কলেজে যখন পড়তুম তখন—ওর নাম কি—খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম, তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মত দেড়হাত দুহাত ফলও ঝুলে পড়েছিল, কিন্তু কি বলে—গোড়ায় জল পেলেনা, সব ফাঁপা হয়ে রইল।" ( ঐ )

"ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিনমাত্রার উত্তাপ আছে—মানুষ যখন বলে ভালোবাসিনে সেটা হ'লো ৯৫° ডিগ্রী, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে ভালোবাসি সেটা হ'ল নাইন্টি এইট পয়েণ্ট ফোর্, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫° ছাড়িয়ে গেচে, তখন রুগী আদর করে বলতে সুরু করেচে পোড়ারমুখী—তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েচে। ·····গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইষ্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়—বিশ্রীরকমের এ্যাক্সিডেণ্ট্ হতে পারে। নাড়ী রসস্থ হলে তাতে ভাষা যে কী রকম এলোমেলো হয়ে ওঠে তা সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম, ডি।" ( শেষরক্ষা )

কোনো কিছুর বর্ণনা করতে করতে serious কথার মধ্যে হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে অতি লঘু রূপক অলংকারের আমদানী করে. অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে Bathos তারই সাহায্যে অনেক সময় রসসৃষ্টি করা হয়েছে।

"সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে, তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আস্‌চে কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে, কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ আর কারো বা সর্ষের তেল ও লংকার বাটনাযোগে বুকজ্বালানি রান্না।" (শেষরক্ষা)

"ত্রেতাযুগে যারা সমুদ্রবন্ধন করেছিলো, জীবহিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল, তার প্রমাণ নেই ···· —মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হ'লো। আর আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রী-পুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেচে কেবল একটিমাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এপারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তাহলে ধিক আমাদের পৌরুষ।" (ঐ)

"আধপেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান্‌ করতে থাকে—জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও—যা চাওসেটি যে বাই-কার্বোনেট্‌-অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পারোনা।" (ঐ)

সাধারণ কথাকে শিল্পিত চাতুর্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহারে চমৎকার রসসৃষ্টি হতে পারে। হাস্যরসের মধ্যে একটা বড় অংশ wit,

এই wit প্রধানতঃ নির্ভর করে কথার খেলার উপরেই। বুদ্ধিগ্রাহ্য সহৃদয়তাই প্রকৃত রসিকের উপলব্ধি ও রসবিস্তারের মূল উপাদান এবং এই উপাদানটি স্ফূর্তিলাভ করে ভাষার নিপুণ ব্যবহারেরই সাহায্যে।

শব্দের অলংকার পারিপাট্য ও ছন্দঝংকারের প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন এবং এরই ফলে রসসৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনার পথকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অধিকন্তু শব্দ ও বাক্যকে নিয়ে রসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয়ে যে নিপুণ খেলার কথা এখানে বলা হ'ল তাতেও তিনি চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ থেকেই এ কথার সার্থকতা প্রমাণিত হবে।

"চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজচি, চোখ বুজে থাকলে স্ত্রী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করচি। কাশলে মনে করে কাশির মধ্যে একটি অর্থ আছে, প্রাণপণে কাশি চেপে থাকলে মনে করে তার অর্থ আরও সন্দেহজনক।" ( বৈকুণ্ঠের খাতা )

"বানর কেউ বানাতে পারেনা, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন।...কবি হওয়া আর কি! লেজই বলো আর কবিত্বই বলো ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।"

( চিরকুমার সভা )

"শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান্ প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।" (ঐ)

নতুন শব্দ সৃষ্টির অদ্ভুতত্বে অনেক স্থানে নিছক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। 'গল্পসল্পে'র বাচস্পতি মশায়ের মনে হয়েছিল যে—"ভাষার

শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে।" অভিধানের গোলামি ঘুচিয়ে ভাষাকে সত্যযুগে নিয়ে যাবার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল এই 'বুনা বুলবুলি' ভাষা (বাচস্পতির নিজের দেওয়া নাম) কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

..."শুনে ছোটলাট একেবারে টরেটম বনে গিয়েছিলেন। মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত, হেড পেডেঙ্গোর টিকির চারধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারী চৌকি থেকে তড়তং করে উৎথিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুমুখো ফুডফুডোমি দেখে মনে হলো তারা যেন সব ফিরিচুঙ্গসের একেবারে চিক্‌চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বলিলেন, বাচস্পতি, এইখানেই খাস্ত দাও হে, আর বেশীক্ষণ চললে পরাগগলিত হায় যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাস্কিম্ মাস্কিম্ করছে!"

বাচস্পতির এই সত্যযুগীয় ভাষার দাপটে মাথার মধ্যে তাস্কিম্ মাস্কিম করলেও মনের মধ্যে যে মৃদু হাস্যরসের সৃষ্টি হয় একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

(খ) গদ্য রচনায় 'কথার খেলা' যেমন প্রধানতঃ অলংকারের পারিপাট্য, অনুপ্রাসের চমক ও শব্দের নানাবিধ শিল্পিত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে রসসৃষ্টির সহায়তা করেছে, পদ্যরচনায় এবং ছড়ার গাঁথুনিতে তেমনি মিলের অপূর্ব ঝংকার এবং ছন্দের বিচিত্র অনুরণন রসের অবতারণা করেছে। নির্দোষ ছন্দ এবং পরিপাটি মিলের যে কঠিন বন্ধন, তারই সংযমে বাঁধা পড়ে হাস্যরস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে।

পূর্বোল্লিখিত 'আষাঢ়ে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথই একস্থানে বলেছেন,—"ছন্দের শৈথিল্য হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান, অবাধ গতিবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুইতিনবার দুইতিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।" সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রসবিচারের মাপকাঠি রসরচয়িতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে তিনি নিজে এ বিষয়ে একেবারেই নির্দোষ। তাঁর হাস্যরসমূলক কবিতা ও ছড়ার ছত্রে ছত্রে অবাধ গতিবেগের উদ্দামতা আমাদের মনকে রস উপভোগের সার্থকতার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় এবং পঙ্‌ক্তি শেষের মিলের বাঁধুনির মধ্যে যে অভাবনীয়তা, যে আকস্মিক রসসঞ্চারের চমক, তাতে আমরা বিস্ময়মুগ্ধ হই। 'আষাঢ়ে' রচয়িতার কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—"উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিংগবৃষ্টি হইতে থাকে, তাহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোকের মুখে তেমনি করিয়া মিলবর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মত আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পূর্ণ।" রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা সম্বন্ধেও একথা সর্বাংগীন ভাবে এবং সার্থকভাবেই প্রযোজ্য। তাঁর রচনাতে অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় মিলের আকস্মিক বর্ষণে এবং ছন্দনৈপুণ্যের নানা বৈচিত্র্যে হাস্যরস উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অজস্র নিদর্শন থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।

"আদর করে মেয়ের নাম রেখেছে ক্যালির্কর্ণিয়া,
গরম হোলো বিয়ের হাট ঐ মেয়েরি দর নিয়া।

মহেশ দাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেটস্ নামে,
খাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুসী নামজাদা সে বর নিয়া,
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে নামের গুণ বর্ণিয়া।"

(খাপছাড়া)

"দিন চলে না যে নিলেমে চড়েছে
খাট টিপাই;
ব্যবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্টি-fy।
ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা
মুর্গি এবং মুর্গি আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-চারটি পাই,
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয় certify॥"

(খাপছাড়া)

"মন উড়ু-উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক,
আলুথালু ভাষা ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্বাধুনিক।
পাঠকেরা বলে এ তো নয় সোজা
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা;
কবি বলে, তার কারণ আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।"

(খাপছাড়া)

"দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable,—
এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দু-জনের পটুতা।"

(ছড়া)

"যতই কেন বলুক না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব কসে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর বাকর চায় মাসহারা চোকানি,
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।"

(প্রহাসিনী)

অনুপ্রাসের চমকেও স্থানে স্থানে রস ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

অল্পেতে খুসী হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোয়া চাই, চাই তাজা ভেটকি,
আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো,
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?"

(খাপছাড়া)

"মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট—"

(ছড়া)

"নাতি আসে হাতি চড়ে খুড়ো বলে, আহা
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
ভাতিনীর নাতিনীর সাথীনি সে হাসে,
বলে, আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে।"

(ছড়া)

শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হোষ্টেলে যত ছাত্র।"

(ছড়া)

"শ্রাবণে ডিপুটিপনা এতো কভু নয় সনা—
-তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।"

( শ্রাবণের পত্র, মানসী )

( ৬ )

(ক) গদ্য রচনায় বুদ্ধিসম্মত কথার খেলার মধ্য দিয়ে রসসঞ্চারের যে চমৎকার কলাকৌশলের কথা পূর্বে বলা হয়েছে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যার সার্থক নিদর্শনও কিছু কিছু উধৃত করে দেখানো হয়েছে, অনেকে এর যথার্থ মূল্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। কথার অন্তরালে যে অনাবিল রস-উৎস, তার সন্ধান তারা পাননি, তাই তারা এর বিরুদ্ধ সমালোচনাই করেছেন। তাদের বক্তব্যের মূল কথা হ'ল এই যে,— "ভাষার গৌরব তাঁহার কাব্য প্রবন্ধ ছোটগল্প ও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ গৌরব কিন্তু ইহা তাহার রসরচনার একটি প্রধান দোষ।"[১] ভাষার যে চাতুর্য তাঁর উপন্যাস প্রবন্ধ ও ছোটগল্পগুলিকে অর্থমাধুর্যে ও ভাবব্যঞ্জনায় গৌরবান্বিত করে তুলেছে, হাস্যরসের ক্ষেত্রে এসে সেই

১ সুবোধ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২১০

গৌরব হঠাৎ কেন অগৌরবে পর্যবসিত হ'ল তা আমরা সাধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝে উঠতে পারিনা। বিজ্ঞ সমালোচকও তার এই উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করেননি।

হাস্যরসমূলক সাহিত্য একটা ভুঁইফোঁড় সৃষ্টি নয়। বর্তমানে সাহিত্যের দরবারে এরও একটা নির্দিষ্ট আসন আছে এবং রসবিচারেও এর একটা স্বাভাবিক দাবী রয়েছে। সাহিত্যের প্রচলিত রসবাদকে এর মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সুতরাং সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে যে কথাবস্তুর সুষ্ঠু ব্যবহারে রসসৃষ্টি ও ভাবের জমাট বাঁধুনির যে ভিত্তি গড়ে ওঠে, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবার কোনো সংগত কারণ নেই, বরং এখানে এই কথার খেলার প্রয়োজন আরো বেশি। "বাক্যের অন্তরালে অর্থের গৌরব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে"—সমালোচকের এই উক্তি প্রকারান্তরে তার নিজের মতকেই খণ্ডন করেছে, নিন্দা করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে তিনি প্রশংসাই করে ফেলেছেন। তার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি যাকে দোষ বলে মনে করেছেন, আসলে তাইই হাস্যরসসাহিত্যের অন্যতম প্রধান গুণ। যে কোনো রসসৃষ্টিরই প্রধান অবলম্বন ইংগিত বা ব্যঞ্জনা, সাহিত্য রচনাতেও বাক্যের অন্তরালে লুক্কায়িত থেকেই অর্থব্যঞ্জনা ও ভাবইংগিত আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সব কিছুকে স্পষ্ট করে দেখাতে গেলে বা বলতে গেলে সেটা নিছক বিবৃতি হয়েই দাঁড়ায় এবং তাতে রসসৃষ্টির মাধুর্য ব্যহত হয়ে থাকে।

বিচার করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির ন্যায় তাঁর হাস্যরসরচনাগুলিও বুদ্ধির ঝিকিমিকি ও সহৃদয়তার স্পর্শে ভাবে ও অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাক্যের বিচিত্র ব্যবহার এখানে ভাবকে আচ্ছন্ন না করে, বরং আরো অর্থসমৃদ্ধ করে তুলেছে। এ

বিষয়ে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তার একটি প্রবন্ধে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে। তিনি বলছেন, "রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস শুধু শব্দাশ্রয়ী ইহা যদি স্বীকার করিয়াও লই তথাপি বলিতে হইবে তাঁহার শব্দালঙ্কার ভাষালক্ষ্মীর অঙ্গে এমন পরিপাটি রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহার অলঙ্কৃতিটাকে পৃথক করিয়া দেখা যায়না। অঙ্গ ও অলঙ্কারে মিলিয়া যে একটা অখণ্ড সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার উপায় নাই। শব্দ কোথাও সশব্দে স্বীয় সত্তা প্রচার করে না…। এই শব্দাশ্রয়ী হাস্যরসের যদি কোনো দোষ থাকে তবে তাহা এই যে মার্জিত রুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন সে রস উপভোগ করিতে পারেনা।"[১]

(খ) প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। এই আলোচনা সূত্রে সমালোচক এক স্থানে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় "humour অপেক্ষা witএর আধিক্য বেশী। wit অর্থে তিনি শুধু কথার মারপ্যাঁচ জাত হাস্যরসকে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন,—"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যেন শুধু কথার মারপ্যাচ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট হাস্যরস। বিলাতী অলংকার শাস্ত্রে এই প্রকার হাস্যরসকে wit বলা হইয়া থাকে।"[২] অর্থাৎ তাঁর মতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই wit বা 'অপকৃষ্ট হাস্যরস'-এর প্রাধান্যই বেশী।

যে সংকীর্ণ বিচার পদ্ধতি witকে 'অপকৃষ্ট হাস্যরস' বলে অভিহিত করে তা অবলম্বন করে রসবিচার করতে গেলে বিচারবিভ্রাট* ঘটে

---

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস—ভারতবর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫০

২। সুবোধ সেনগুপ্ত-রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২১০

থাকে। প্রকৃষ্ট হাস্যরস মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় দুটোকে জড়িয়েই উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। শুধু হৃদয়কে নিয়ে যে এক প্রকার আবেগপ্রধান অগভীর হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় তাতে আমাদের সাময়িক মানসিক আলোড়ন ঘটলেও এর কোনো স্থায়ী ছাপ আমাদের মনে পড়তে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে সংযত ও দৃঢ়বদ্ধ না করলে নিছক উচ্ছ্বাসের আবেগসর্বস্ব ভিত্তি স্থায়িত্বের দাবী করতে পারে না। যে সৃষ্টি হৃদয়কে আলোড়িত করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিকেও নাড়া দিয়ে যায়, যাতে আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও পরিতৃপ্ত হয়. তাকেই প্রকৃষ্ট রসসৃষ্টির স্থায়ী মর্যাদা দেওয়া যায়।

বর্তমান যুগের মানুষ শুধু আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে অবলম্বন করে তৃপ্ত হতে পারেনি. বুদ্ধিশীল মনের খোরাকও তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মননশীল চিত্তবৃত্তিও নিছক উচ্ছ্বাস ও আবেগের সাহায্যে লঘু অগভীর রসসৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, সেই উচ্ছ্বাস ও আবেগের অন্তরালে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত মনের পরিচয়ও সর্বত্র ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছে। তাই তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস শুধু হৃদয়গ্রাহ্যই নয়, এ আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্যও বটে। এই বুদ্ধিগ্রাহ্য রসসৃষ্টি—সমালোচকের মতে যা 'অপকৃষ্ট হাস্যরস'—রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস রচনার প্রাণস্বরূপ। সাহিত্যরস রসিক প্রমথ চৌধুরী এই জাতীয় রচনাগুলিকেই বলেছেন **"spiritual lightning."**

বুদ্ধির আবেদনকে বাদ দিয়ে যে নিছক হাস্যরস তাকে comic পর্যায়েই স্থান দেওয়া চলে। আধুনিক সূক্ষ্মরুচিপ্রবণ মানুষ শুধু comic-এর স্থূল হাস্যকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না, তাই humour ও wit-এর একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যকেই আধুনিক হাস্যরসের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় অতি সার্থকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। wit

এবং humour এখানে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে একত্রে চমৎকার রসসৃষ্টির সহায়তা করেছে।

(গ) পূর্বোক্ত সমালোচকই অন্যত্র বলেছেন যে "গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধিতা আছে।···তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) প্রতিভার সঙ্গে গীতিকবিতার বিশেষ মিল আছে বলিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হউক তাঁহার রচনায় হাস্যরস প্রায় কোনো স্থানেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই।"

গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধের যে কারণ সমালোচক দেখিয়েছেন বিচার করলে দেখা যাবে যে তা অর্থহীন। আত্মগত অনুভূতির যে গভীরতা গীতিকবিতার মূলে থাকে, সত্যকার হাস্যরস স্রষ্টার পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে। জগত ও জীবনের আপাত কঠোর বাস্তবতার মধ্যে যে অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা আমাদের চোখে পড়ে না, তাইই হাস্য বসিকের রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান। অনুভূতির গভীরতা না থাকলে একে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায় না এবং এগুলিকে নিয়ে সার্থক হাস্যরস সৃষ্টিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাভাবিক গীতিধর্ম-প্রবণতা তাকে প্রকৃষ্ট হাস্য রসস্রষ্টা হতে বাধা না দিয়ে বরং সহযোগিতাই করেছে।

তাঁর "রচনায় হাস্যরস প্রায় কোনো স্থানেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই"— সমালোচকের এই উক্তির বিস্তৃত আলোচনা একান্তই অবান্তর। ইতস্ততঃ যে কয়েকটি নিদর্শন আমরা দেখিয়েছি তা থেকেই রসিক পাঠক সমাজ এই উক্তির অসারতার প্রমাণ পাবেন। গীতধর্মী রবীন্দ্র-প্রতিভা যে প্রয়োজনবোধে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টি করতেও সক্ষম এগুলিতে তারই যথোচিত পরিচয় পাওয়া যাবে। পূর্বোক্ত সমালোচকও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিচয়কে স্বীকার

না করে পারেননি। তৎসত্ত্বেও এই জাতীয় অর্থহীন বিরুদ্ধ উক্তি তিনি কেন করলেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই নিজের মন্তব্য উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—"মানুষের বিচার বুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে কোন সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা মহলের বাইরের জিনিষ। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতঃই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমার-সভা' ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে হাস্যরসটা অগভীর, কারণ কারণ আর কিছুই বলতে হবে না, কারণ তার সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।"[১] এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। সমালোচকের সংস্কারগত অতি তীক্ষ্ণতাকে সযত্নে পরিহার করে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসমূলক সাহিত্যে 'প্রকৃষ্ট' রসের সন্ধান পেয়ে পরিতৃপ্ত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

(৭)

লোকোত্তর প্রতিভা তাঁর নিজের পথ নিজেই খুঁজে বের ক'রে আপনার গতিবেগে নবসৃষ্টির সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। প্রচলিত গণ্ডি ও সংজ্ঞাকে সর্বত্র মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়না। তাই তাঁর বিচারের মাপ কাঠিকেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসসাহিত্য তাঁর লোকোত্তর প্রতিভারই অন্যতম সৃষ্টি এবং এর ভিতরেও তাঁর মননশীলতা রসপ্রবণতার বৈশিষ্ট্য

---

১ সাহিত্যবিচার—সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ ৪৭

নানাভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে হাস্যরসের প্রচলিত মানকে রস পর্যায়ের উচ্চস্তরে উন্নীত করে দিয়েছে। এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর স্বকীয় রসআভিজাত্য সম্পূর্ণ বজায় আছে।

প্রহাসিনীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে,
বিধাতার স্নেহ তাতে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হাল্‌কা হাসি দেবতার দানে।
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে
মূল্য তার মনে মনে জানি।"

প্রকৃত সাহিত্য-রসিক পাঠক সমাজ—যাঁরা তাঁর অপূর্ব রসসাহিত্যের রস আস্বাদনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন--তাঁরাও এই "হাল্‌কা হাসি"র প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদাকে শুধু মনে মনে নয়, স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমায় এই আপাত ক্ষুদ্র রসতীর্থগুলি সর্বত্রই মার্জিতরুচি রসিক জনচিত্তের অকুণ্ঠ প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

---